তমসুক

আশ্বিন ১৪২৬ / অক্টোবর ২০১৯

সূচিপত্র

তমসুক

আশ্বিন ১৪২৬/অক্টোবর ২০১৯
৩৩—৩৬ বর্ষ : ৩৮ সংখ্যা

স ম্পা দ কে র ক ল ম ৭

স্ম র ণ

প্রবন্ধ

কবিতার মিল / অশ্রুকুমার সিকদার ৯

কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৩ পিনাকী ঠাকুর ১৪ সমর চক্রবর্তী ১৫
নিত্য মালাকার ১৬ পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত ১৭

● ● ●

প্রবন্ধ

বুদ্ধদেব বসুর ছন্দ-ভাবনা / সুমিতা চক্রবর্তী ১৮
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা / ববিতা রায় ২৯

কবিতা, এ সময়

তপোধীর ভট্টাচার্য ৩৫ সন্তোষ সিংহ ৩৬-৩৭ অমর চক্রবর্তী ৩৮ নিখিলেশ রায় ৩৯
অলক সাহা ৪০ ভগীরথ দাস ৪১ রূপক সান্যাল ৪২-৪৩ বেণু সরকার ৪৪
দীপক চক্রবর্তী ৪৫ তনুশ্রী পাল ৪৬ অমিতকুমার দে ৪৭ অভিজিৎ রায়গুপ্ত ৪৮
আবদুল্লাহ্ মিঞা ৪৯ গৌতমী ভট্টাচার্য ৪৯ অনুভব সরকার ৫০ শুভাশিস চৌধুরী ৫০
গৌতমকুমার ভাদুড়ি ৫১-৫২ সঞ্জয় সোম ৫৩ অজিত আধিকারী ৫৪-৫৫
সুজিত অধিকারী ৫৬ উত্তম চৌধুরী ৫৭ সঞ্জয় সাহা ৫৮ অমিয়কুমার চৌধুরী ৫৯
পাপড়ি গুহ নিয়োগী ৬০ সুবীর সরকার ৬১ মাধবী দাস ৬২
অচিন গঙ্গোপাধ্যায় ৬৩-৬৪ বিবেক চৌধুরী ৬৫ রঞ্জন চক্রবর্তী ৬৬
গার্গী প্রিমরোজ চৌধুরী ৬৭ বাবলি সূত্রধর সাহা ৬৮ গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী ৬৯
নীলাদ্রী দেব ৭০ গৌতম গুহ রায় ৭১ বিজয় দে ৭২-৭৩ দেবাশিস মল্লিক ৭৪
সমীর চট্টোপাধ্যায় ৭৫

তিন কবির কলমে চেতনার নানা রং

আবদুস সালাম সমু ৭৬-৭৯ বর্ণশ্রী বক্সী ৮০-৮২ রঞ্জন রায় ৮৩-৮৫

●

গ্রন্থ আলোচনা

দীপক চক্রবর্তীর 'কবিতা এভিনিউ' / অমর চক্রবর্তী ৮৬-৯৩

সমীর চট্টোপাধ্যায়ের 'এলুয়া কাশীয়ার ফুল' / মৃণালকান্তি দাম ৯৪-১১৪

●

ক্রোড় পত্র / পীযূষ ভট্টাচার্য

পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে বহুমাত্রিকতা / অর্ণব সেন ১১৭-১২২

পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে জীবন পাঠ : কবিতার আখরে লেখা / পঞ্চানন মণ্ডল ১২৩-১৩৫

পীযূষ ভট্টাচার্যের কীর্তিমুখ : সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে / রূপদত্তা রায় ১৩৬-১৪৭

মনস্তত্ত্ব, উত্তর আধুনিকতা এবং পীযূষ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প /নবনীতা সান্যাল ১৪৮-১৫৪

পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প : সময়ের 'দহ' / রঞ্জন রায় ১৫৫-১৬১

পীযূষ ভট্টাচার্যের 'তালপাতার ঠাকুমা' :
এক আখ্যানের সহস্র গতিপথ / প্রলয় নাগ ১৬২-১৬৬

পীযূষ ভট্টাচার্য : মিথের জাদুকর / সোমনাথ ভট্টাচার্য ১৬৭-১৭৪

পীযূষ ভট্টাচার্য : জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি ১৭৫-১৭৬

সম্পাদক : সমীর চট্টোপাধ্যায়

সংযুক্ত সম্পাদক : পঞ্চানন মণ্ডল ও চিত্তরঞ্জন বর্মন

প্রচ্ছদ : রবীন মণ্ডল

প্রচ্ছদ নামাঙ্কন : প্রবীর সেন

অলংকরণ : রিন্টু কার্যী

যোগাযোগ : চ্যাটার্জি কটেজ, রবীন্দ্রনগর, কোচবিহার ৭৩৬ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ

মোবাইল : ৯৪৭৪১-৪৬২৫৭

মূল্য : ১০০.০০ সডাক : ১৭০.০০

মুদ্রণ : আর্ট-টাচ্ অফসেট, ভাওয়াল মোড়, কোচবিহার-৭৩৬১০১

তমসুক

পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে বহুমাত্রিকতা

অর্ণব সেন

বাংলা সাহিত্যে অধিকাংশ লেখকই লেখালেখি শুরু করেছেন বয়সটা কুড়িতে পৌঁছানোর আগেই। অনেকের হাত-মক্সো চলে স্থানীয় ছোট পত্রপত্রিকায়। অবশ্য কেউ কেউ প্রতিষ্ঠিত বড় পত্রিকায় গল্প লিখে হৈচৈ ফেলে দেন। এমনটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে হয়েছিল। আবার দেবেশ রায়ের 'হাড়কাটা' গল্পটি তাঁর কলেজপাঠের কালেই 'দেশ' পত্রিকায় বেরোয়। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও খুব অল্প বয়সেই লেখা আরম্ভ করেছিলেন। তবে কিছু লেখক আছেন অন্যরকম, যাঁরা অনেকটা প্রস্তুতিপর্বের পর লিখতে আরম্ভ করেন।

পীযূষ ভট্টাচার্য সেই অন্যরকম লেখক যিনি ৭০ বছরে পৌঁছে জানিয়েছিলেন, তাঁর লেখালেখির বয়স ৩৫ বছর (উত্তর ভাষা, ডিসেম্বর ২০১৬)। ব্যাপারটা এই রকম,

তাঁর জীবনের প্রথম গল্প লেখা হয়েছিল বছর তিরিশ পার করার পর। লেখাটি বেরোয় বালুরঘাটের 'প্রতিলিপি' পত্রিকায়। তাহলে তিনি এতদিন লেখেন নি কেন— এই প্রশ্ন পাঠকমনে দেখা দিতে পারে। অথচ তিনি সাধারণ মাপের লেখক নন। যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই ঘোষণা করেন— 'গোলগল্প লিখি না বলে দুর্বোধ্য বলা হত প্রথমদিকে।' তবু তিনি লিখে গেছেন। যতদূর জানি, এখন পর্যন্ত উপন্যাস ছাড়াও অন্তত দশটি গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছে। বাংলা ভাষার পাঠকসমাজ অবশ্য তাঁর সব বইপত্তর ইচ্ছে করলেই হাতে পান না। তার জন্য খোঁজখবর নিতে হয়, যোগাযোগ করতে হয়। তাঁর জীবনযাপন বালুরঘাট শহরে।

তিনি তাঁর লেখার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবেই বেছে নিয়েছেন তাঁর না-লেখালেখির প্রায় বছর তিরিশ। এই সময়টার সংগ্রহ নিজের বেঁচে থাকার লড়াই থেকে, সংগ্রমী জীবন থেকে, এবং তাঁর নিজভূমি বালুরঘাট এবং কাছাকাছি এলাকা থেকে। তিনি লিখেছেন— 'গোলগল্প লিখি না বলে দুর্বোধ্য বলা হত প্রথম দিকে।' ঠিকই লিখেছেন, আসলে তিনি সাধারণ বিনোদন-সর্বস্ব গল্প লিখতে চাননি, নিজেকে তৈরি করেছিলেন অন্যরকম নিজস্ব ধারার গল্পকার হিসেবে। তাঁর গল্প যাঁরা পড়েন, তাঁরা খানিকটা পড়েই বুঝে যান, এবার প্রস্তুত হতে হবে মনোযোগী পাঠক হিসাবে, অথবা তুলে রাখতে হবে বইটা। আমাদের চারপাশে 'গোলগল্প' বা নিছক বিনোদনধর্মী গল্পকারের সংখ্যাই বেশি। তাঁদের জনপ্রিয়তা হয়ত আছে সাধারণ পাঠকসমাজের কাছে। তবে সেই জনপ্রিয়তার খোঁজে পীযূষ ভট্টাচার্য নেই। তাই কদাচিৎ তিনি বাণিজ্যিক ম্যাগাজিনে লিখলেও লিটল ম্যাগাজিনের লেখাই লেখেন। তাঁর কথা ঃ 'কাগজের চাহিদা অনুযায়ী লিখি না।'

পীযূষ ভট্টাচার্যকে 'এক নজরে' দেখলে খুব গতানুগতিক একটা জীবনের ছবি চোখে পড়বে। শৈশব কেটেছে কলকাতার চিৎপুরে, নীলফামারিতে, সোনাদায়, কিন্তু ১৯৫৮ থেকে বালুরঘাটে। জন্ম বালুরঘাট শহরে। বালুরঘাটের পূর্তদপ্তরের চাকরি, অবসর এবং স্ত্রী-কন্যাদ্বয়কে নিয়ে জীবনযাপন। আপাতবিচারে খুব গতানুগতিক মনে হয়। তাঁর আসল পরিচয় তাঁর লেখালেখি, তাঁর আত্মকথন, তাঁর চিন্তা ও মননের জগৎ— যার অনিবার্য প্রতিফলন খুঁজতে হবে, তাঁর গল্পের ভাষায়, কাহিনিকথনে, গল্প এবং না-গল্পের সমীকরণে (সাধন চট্টোপাধ্যায়ের কথায়)।

তিনি লেখার মধ্যে পরোক্ষ আত্মপ্রতিষ্ঠানে বিশ্বাসী। তাই লেখক : 'আসলে আমার সৃষ্ট চরিত্ররা আমারই মতন অন্তেবাসী। আত্রেয়ী-পুনর্ভবা-টাঙ্গন-এর তীরবর্তী বাসিন্দা। প্রচীন এই তিন নদী পুরাণ বর্ণিত কাহিনি নিয়েও না মরে বেঁচে আছে এখন। এ বেঁচেথাকা নির্দিষ্ট একটা ঋতুর জন্য, বর্ষা কখন আসবে। এরাও অনেকের মতন দেশভাগ মেনে নিতে পারেনি।

পীযূষ ভট্টাচার্যের কাছে বালুরঘাট এবং কাছাকাছি এলাকাটা জেমস জয়েসের

তারুণ্যের ডাবলিন শহরের মতো, জয়েস লিখেছিলেন 'ডাবলিনার্স', কিন্তু পীযূষ ভট্টাচার্য ছোট শহরের পরিধির মধ্যে থেকেই তাঁর চৈতন্যের অন্তর্জালকে বিস্তারিত করে দেন দূর-দূরান্তরে। গল্পের এক বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করেন তিনি। এক বিশেষ সময়-পরিবেশ পরিস্থিতি এবং সংস্কার, মিথ, এক বিশেষ রাজনীতি, মতাদর্শ তাঁর গল্পগুলোর ভেতরে ছায়া ফেলে বারবার।

তাঁর 'কুশপুত্তলিকা' (১৯৯৫) প্রথম গল্পগ্রন্থ। এই গল্পগুলোর মধ্যে প্রায়ই প্রধান চরিত্রটির রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা প্রাধান্য পায়। সত্তর দশকের অবিরাম রাজনীতি মধ্যপন্থাকে চায় না। 'কুশপুত্তলিকা'-য় সেই বক্তব্য স্পষ্ট। 'পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প' (১৯৯৮) দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। 'মাছ', এক 'ছোঁয়া বঁড়শি'— দুটি গল্পেই নদী, মাছধরা এবং লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার একটা শৈলীভাবনার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেন। ঘটনা, চরিত্র এবং ভাবব্যঞ্জনা এই ত্রিধারাকে মিশিয়ে দেন লেখক, অথবা গুরুত্ব দেন বিশেষ বস্তুর ওপর। শচীর মাছধরা প্রসঙ্গে লেখেন : 'মাছ, মাছ ছাড়া সর্বস্ব গল্পহীন শচীর কাছে।' আসল গল্পটা অন্যত্র, নির্মম হত্যালীলার গল্প।

'বোধনপর্ব, গল্পে পীযূষ ভট্টাচার্য চলে গেছেন রাজনীতি জটিল ও কুটিল স্বার্থপরতার দিনটি উন্মোচনের দিকে। তাই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলিকে নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের দিকটি এখানে তুলে ধরা হয়। তার কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যসুন্দর। বাংকা বর্গাদার না হলেও অনেকটাই সত্যসুন্দরের উল্টোপিঠ। গণপ্রহারের মতো এক গণহিস্টিরিয়ার পরিবেশ চিত্রিত হয় 'দহ' গল্পে।

'কীর্তিমুখ' গল্পগ্রন্থের 'কীর্তিমুখ' রাজনৈতিক পটভূমিতে কিছু রোমান্টিক গল্প। পটভূমি উগ্রপন্থী আন্দোলনের কাল। 'অলৌকিক পাণ্ডুলিপি' পড়ে বোঝা যায়, একদা লেখক জীবন শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মহিম্ন অসুখ মহিম্ন যন্ত্রণা'। এই কবিতার বোধ পরবর্তী পর্বে ছড়িয়েছে গদ্যগল্পের ভাষার মধ্যে। 'সিজলি মার্ডির পৃথিবীতে চিতাবাঘ' গল্পে অন্ত্যজ নারী সিজলি অত্যাচারিত হয় বাইক আরোহী হারু বিশ্বাসের দ্বারা। চিতাবাঘের পিঠে সওয়ার ব্যাপারটা অন্ধশক্তির উপমা হয়ে ওঠে। সাপও হয়ে ওঠে প্রতীকী।

পীযূষ ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক গল্প এবং কাহিনিসর্বস্বতাকে উপেক্ষা করে বেছে নিয়েছেন এক অন্যরকম ভাষা, অন্যরকম বিষয়বস্তু। খুব সামান্য ছোটখাট একটা বিশেষ অঞ্চল, তার নদী, তার অতি সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষ, তাদের জীবনের দু'একটি অতি সাধারণ উপকরণ,— এইসব নিয়ে অনেক ব্যাপক বৃহত্তর বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় পাঠককে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস তাঁকে 'ব্যতিক্রান্ত' গল্পকার করে তোলে। গল্পের ভেতরে অন্য গল্প,—জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতো 'বাতাসের ওপারে বাতাস'— এমনি এক

পরাবাস্তবতার অন্বেষণ করেন লেখক। 'ক্ষরণ' সেই অদ্ভুত ভাষা, ইতিহাস ও প্রতীকের অন্বেষণ : 'শতাধিক বছরের আয়ুষ্কালের অভিজ্ঞতায় শকুন যেভাবে পায় মৃতের সন্ধান, তার প্রকরণ পদ্ধতি যতই রহস্যময় থাকুক না কেন— তা যেন অলৌকিক হয়ে ধরা পড়ে প্রতিটি শকুনের আকাশ থেকে নেমে আসার ক্ষেত্রে। তখন মানুষের খাড়া হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গির লক্ষ লক্ষ বছরের ইতিহাস বাতিল করে একটা মানুষ মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে।'

পীযূষ ভট্টাচার্য তাঁর পুরস্কার প্রাপকের অভিভাষণে (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি) লিখেছিলেন বা বলেছিলেন তাঁর নিজের সম্পর্কে কিছু কথা, লেখার বিষয়ে কিছু সংকেত ছিল : '.... আমার বেশির ভাগ সূত্রই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তরের লোককথা, বিভিন্ন জনজাতির লোকশ্রুতি, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসগার, পরিচিত-অপরিচিত এমনকি আঞ্চলিক মিথ, আঞ্চলিক ইতিহাস ইত্যাদি থেকে। এই Oral tradition-এর মধ্যে ঢুকে গেছে সামাজিক, রাজনৈতিক ইস্যুগুলির বিস্তার।' এই মন্তব্যটি পীযূষ ভট্টাচার্যের পাঠকদের চমকিত করে। তবে তার চেয়েও বেশি চমকিত ও বিস্মিত হতে হয় যখন আমরা পড়ি বা শুনি The Communist Manifesto-র ন্যারেটিভের অবতারণা। লেখাটির মধ্যে শৈলী ভাবনায় আছে উপযুক্ত কথনভঙ্গি ও প্রকরণের মধ্যে রোমান্টিক গথিক নভেলের বিস্তার ও নাটকীয়তা। তাঁর নিজের ভাষায়— 'এরকম একটি আদ্যন্ত রাজনৈতিক আইডিয়ায় এগুলি থাকার জন্যই অভিঘাত তৈরি করে চলছে আজও।' বলাবাহুল্য তাঁর আসল লক্ষ্য 'আমার একমাত্র কাজ বীজকে অঙ্কুরিত করে বৃক্ষে পরিণত করবার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া।'

তাঁর 'পদযাত্রায় একজন' গল্পগ্রন্থের (জানুয়ারি ২০০৪) প্রথম গল্প 'পদযাত্রায় একজন' আরম্ভের ভাষাটাই চমকে দেবে পাঠককে।

'ধনেশ পাখির হাড়হাড্ডি সবকিছুই মানবজাতির মঙ্গলের জন্য তৈরি এরকম একটা কথা শোনার পর পাখিটিকে ভালভাবে লক্ষ্য করতেই দেখি পাখিটি আমার দিকে তাকিয়ে— এ যে ভবিতব্যের দৃষ্টি, শতাব্দীরও আগে যেন স্থির হয়েই ছিল দেখা হয়ে যাওয়ার।' এসব দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। ছোটবড় শহরের কোর্টকাছারির কাছাকাছি এলাকায়। পথচারীকে আকৃষ্ট করে জড়িবুটিওলা নানা উদ্ভট উপকরণ সাজিয়ে। মৃত ধনেশ পাখি নিয়ে বিক্রেতা নানা সমস্যা ও অসুখের সমাধান করে। হারানো ভালবাসা, বায়ুবিকারের চিকিৎসার জন্য গর্দভের প্রস্রাব ইদ্যাতি। চলমান দৃশ্যাবলীর মত ঘটনাবলী আসে, চলে যায়। অবশেষে উকিলকে বিদায় দিয়ে কথক রিকশো ডাকেন, কিন্তু সেই রিকশো ডেকে নেয় ধনেশপাখিওলা। ''আমি জানি রিকশোওয়ালা প্যাডেলে চাপ দেওয়ার আগে একবার দেখে নিতে চাইবে আমাকে ধনেশপাখির অনন্য এক ভঙ্গিমায়— কিন্তু আমার ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে পায়ে হেঁটে চলা।'' গল্পে দুটি পর্বের মাঝখানে টুকরো টুকরো ঘটনা, ছবি, সংকেত, চরিত্রমালা ছড়িয়ে থাকে। কেউ স্থির নয়, চলমান পদযাত্রীর কাছে, পাঠকের কাছে।

'পশু' ট্রাকে ছাগল চালান দেওয়া নিয়ে গল্প। বাংলা-বিহার চেকপোষ্ট পার করতে ছাগলবোঝাই ট্রাক। আকাল আর বাসনার ব্যবসা। ব্যবসাই তাদের পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে আনে। খুঁটিনাটি বহু বর্ণনার পর আছে ছাগলগুলোকে এক কেজি চানা খাওয়ার কথা। চানার ওজন তখন যুক্ত হবে ছাগলের ওজনের সঙ্গে। 'ন-টাকার চানা আঠারো টাকায় বিকোবে।' ঠিক সেই সময় দেখা যায় ভরভরন্ত ছাগলটির মৃতদেহ। আকাল ভাবে— 'শব তো শুভই তা পশুরই হোক আর মানুষেরই। তখনই সে ভাবে গর্ভের শিশু সহ ওজন কত হত!' মানুষও মাঝে মাঝে পশু হয়ে যায়। এই জন্যই 'গ্যালিভার ট্রাভেলস লেখক জোনাথান সুইফট (১৬৬৭-১৭৪৫) বলেছিলেন 'Man called animal' 'মানুষ নামক পশু'!

'চোরাকুঠিতে একা এবং কয়েকজন' গল্পের প্রথমেই আছে— 'দরজা খুলে মৃদু হেসে বাঁদিকে ঘাড় কাত করে ঢুকতে ইশারা করে মহিলা।'' এভাবেই আরম্ভ এক বদ্ধগুমোট চোরাকুঠির গল্প। ঘরে যারা অপেক্ষা করে তারা অবশ্য টিভির টেনিস খেলা উপভোগ করে সময় কাটাতে চায়। একাকীত্ব অনুভব করেন কথক-লেখক। সোফায় বসে সে দেখে বিভিন্ন রকমের মাটির ঘোড়া। প্যালিওলিথিক যুগে মানুষেরা ঘোড়া শিকার করে খেত বলেই এগিয়ে এক ধাপ। আবার সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব অর্জনের জন্য ঘোড়ায় চেপে গৃহত্যাগ করেন। আসল ব্যাপারটা মানসিক ভারসাম্যহীন মিনুর চিকিৎসার ব্যাপারে উপস্থিত লেখক। সামান্য কিছু কাগজপত্র, ডায়েরি ইত্যাদি দেখে সুকমল বলেছিল— 'আমি তো ডাক্তার নই।' ভারসাম্যহীন মিনুর অস্তিত্বের আন্বেষণ চলে; কিন্তু চোরাকুঠি খুঁজে যাওয়া যায় না। সুকমল মিনুকে উপেক্ষা করেছিল যখন সে পার্টিতে নিজের জমি ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত। মিনু একটা মানসিক চোরাকুঠিতে বন্দি, হয়ত একদিন বাইরে বেরিয়ে দেখবে এক অরণ্যমায়া। কিন্তু চোরাকুঠির দমবন্ধ অন্ধকার পাঠককে মনে করিয়ে দিতে পারে জাঁ-পল সার্ত্র রচিত 'দেয়াল' গল্পের কথা। সেখানে জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী কয়েকজন মৃত্যুর মুখোমুখি। সেই ভয়াবহতা অন্যরকম পরিস্থিতিতেও একটা আতঙ্কের জন্ম দেয়। তবে অরণ্যমায়া কি সত্যি হবে, না মরীচিকাই থাকবে?

পীযূষ ভট্টাচার্য এমন একজন গল্পকার যাঁর ছোট গল্পের পাঠককে— যোগ্য পাঠক হতে গেলে উপযুক্ত প্রস্তুতিপর্বের দরকার হতে পারে। তাঁর গল্পে পুরাণ-ইতিহাস-প্রত্নতত্ত্ব-রাজনীতি-লোকায়ত জীবনসংস্কার এবং নানা বিষয় জড়িয়ে থাকে কাহিনিবিন্যাসে ও ভাষায়। আবার আমরা তাঁর লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে পাই প্রবন্ধধর্মিতা, যদিও প্রমথ চৌধুরী কথিত তাঁর গল্পকে 'না-গল্প না-প্রবন্ধ' বলা যাবে না। তাঁর কিছু অভিভাষণ থেকে তাঁর মার্কসবাদ ও বামপন্থার প্রতি আগ্রহ-অনুরাগও স্পষ্ট। আবার মাঝেমধ্যে অস্তিবাদী দর্শনও তাঁর লেখায় ছায়া ফেলে। দুটি দর্শনই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ আলোড়িত করেছিল।

দুটি দর্শনের সম্পর্ক প্রসঙ্গে David Cante জাঁ-পল সার্ত্র-রচিত 'What is Literature' বইয়ের ভূমিকায় লেখেন : 'He now regards Marxism as the philosophy of our time, and existentilism as merely an ideology existing within the margin of Marxism and having only a transitional utility.'

অবশ্য পীযূষ ভট্টাচার্য নিজের অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন।

পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে জীবনপাঠ : ক্রবিতার আখরে লেখা

পঞ্চানন মণ্ডল

শিল্পকলার মধ্যে যত বৈচিত্র্য থাকুক না কেন তার ফলশ্রুতি আনন্দলাভ। তাই সঙ্গীত হোক বা স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা কিংবা সাহিত্য নাট্যকলা নৃত্যকলা হোক, এদের গ্রন্থি বাঁধা একটি সূত্রে, তা হল এরা প্রতি মুহূর্তে নতুন, অনাস্বাদিতপূর্ব এবং এদের মধ্যে এমন এক পবিত্র সম্মোহনী সত্ত্বা আছে যা হৃদয়তন্ত্রীর হ্লাদিনী শক্তির সঙ্গে অদৃশ্য অথচ দৃঢ়পিনদ্ধভাবে বাঁধা। পীযূষ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একথা উপস্থাপনার কারণ, তিনি শব্দ দিয়ে ছবি আঁকেন, শব্দ দিয়ে ভাস্করের মতো মূর্তি গড়েন যা দেখে পাঠক আত্মবিস্মৃত হয়। প্রাচীন সাহিত্যে বলা হয়েছে, 'শব্দই ব্রহ্ম'; এই শব্দ যেমন অসীম শক্তিধর, তেমনি তার পল্লবিত হবার সুযোগ আছে। শব্দই সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের কারণ। এই সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের ব্যাপক প্রক্রিয়া চলে অন্তরাত্মায়, মনোজগতের

অন্দরমহলে। এই অন্দমহলে সবার ঠাঁই না হলেও সচেতন পাঠকের সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়াবেগের নিশ্চিত যাতায়াত সেখানে। তাই পীযূষ ভট্টাচার্যের মতো পরিমার্জিত তত্ত্বানুসন্ধানী লেখকগণ যখন প্রতিটি শব্দকে যথাযোগ্যতায় বিচার বিশ্লেষণ করে স্বল্প পরিসরের রচনায় কবিতার মতো করে উপস্থাপিত করেন, তখনই মনে হয় শব্দটির নবজন্ম হল এবং তখনই ঐ শব্দের মধ্য দিয়ে গভীর ওঁকার ধ্বনি সমস্ত জগৎকে করে তোলে আনন্দ মুখরিত।

এই স্বল্প কথার বাকবিন্যাসের মধ্য দিয়ে কবিতার পরাগরেণু যেন মিশে যায় গদ্যের পরিশীলিত অবয়বে। পীযূষ ভট্টাচার্যের বিশেষত্ব এখানেই, তিনি তাঁর সময়ে স্বতন্ত্র তো বটেই, বরং বলা যায় তাঁর মতো লেখক বাংলা সাহিত্যে অল্প। কারণ তিনি গোলগল্প লেখেন না। না গল্পের যে আন্দোলন তার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হলেও, তিনি বড়ো কাহিনি নিয়ে কিংবা আদ্যন্ত সমন্বিত কাহিনি নিয়ে গল্প লেখেন না। বিশেষ কিছু শব্দের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তিনি গড়ে তোলেন তাঁর গল্পের পরিসর। সেখানে যেমন মিথের স্বচ্ছন্দ আনাগোনা, তেমনি পরাবাস্তবের আবির্ভাব ঘটে অনিবার্যভাবে। আবার ব্যাঞ্জনাধর্মী কাব্যগন্ধি শব্দ, ভাষার লালিত্যকে বাড়িয়ে তাকে অভিনব করে তোলে। তাঁর গল্পে যেমন ৭১ এর যুদ্ধ, জরুরি অবস্থা, জাতিদাঙ্গা, নকশাল আন্দোলন এর প্রসঙ্গ আসে, তেমনি আসে 'মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার সমসাময়িক বানগড় পালযুগ বৌদ্ধ ও মুসলিম পিরিয়ড, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে তেভাগা এমন কি ১৯৪৬ এর আন্দোলনের ইতিহাস'।

পীযূষ ভট্টাচার্য যা বলেন, যে সময়ের ছবি আঁকেন, তার মধ্যে থাকে লেখকের গভীর উপস্থিতি, শুধুমাত্র ন্যারেটারের মতো তিনি ঘটনার বিবরণ দেন না। নিজেও যেন চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গভীর সহানুভূতি নিয়ে হৃদস্পন্দন ফুটিয়ে তোলেন তাঁর কাহিনীতে। উত্তম পুরুষের বাচনে হোক বা অন্য যে কোনো চরিত্রের চালনার ক্ষেত্রে লেখকের গভীর প্রত্যাদেশ চরিত্রগুলিকে অসাধারণত্ব দেয়। পুনর্ভবা আত্রেয়ী টাঙ্গন অধ্যুষিত বালুরঘাটের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদ বিশ্বাসযোগ্যভাবে তাদের অলক্তরঞ্জিত পদচিহ্নের ছাপ রেখে যায়। পীযূষ ভট্টার্যের চোখে কলকাতার মোহাঞ্জন নেই, কলকাতা থেকে প্রায় পাঁচশ' কিমি দূরে নিজের নিজস্বতা নিয়ে তিনি অকৃত্রিমভাবে রাজ করেন। সুধীর চক্রবর্তীর কথায়—

'এর চেতনা পরিপার্শ্ব আর ভাবনার কোথাও গাঙ্গেয় স্পর্শ নেই, নেই বঙ্গীয় লেখককূলের, অনপনেয় কলকাতা মুখিনতা। সেটা স্বস্তির কথা। নীলফামারি আর বালুরঘাটে লালিত একজন সংবেদী কথাকার তাঁর মতো বোধভাষ্য রচনা করে যে সব আখ্যান সামনে এনেছেন তার অন্তঃপটে অনেক ভিন্নতর যাপন, লোকাচারের স্মৃতি, জলীয়তা আর বাতাসের শুশ্রূষা।'

তাই বহুল পরিচিত না হয়েও পীযূষ ভট্টাচার্য বিশিষ্ট। মনস্ক পাঠক মন্ত্রমুগ্ধভাবে

তাঁর গল্পের বাচন ও নৈঃশব্দ্যকে উপলব্ধি করতে করতে গভীর এক অনুভবের জগতে পৌঁছে যান। রাজনৈতিক হোক বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত, দেশীয় লোকাচারের ঘনঘটা হোক বা আধুনিক জীবন বিন্যাস, পাঠককে নতুন প্রেরণা ও নবতম বোধের মুখোমুখি করে। এই আত্মমগ্নতাই লেখক ও তার লেখার বিশেষত্ব। ঘটনার ঘনঘটা নাই থাকুক। অধিকাংশ গল্পই মনস্তাত্ত্বিক এবং এই মনস্তাত্ত্বিকতা পাঠককে স্বপ্নের বীজ বুনতে সাহয্য করে। তাই গল্প শেষ হবার পরও পাঠকের মন নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় পীযূষ ভট্টাচার্যের ক্ষুরধার চিন্তার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায়।

'জঠর' গল্পে হিরণ্ময় একলা পথিক। বিবাহিত বৌ পরপুরুষের সঙ্গে চলে যাবার পরও প্রাক্তন স্ত্রী সুষমার প্রতি হিরণ্ময়ের সহানুভূতি ও দুর্বলতা কম নেই। তিনমাসের গর্ভের সন্তানটিকে বাঁচানো যায় নি সুষমার, তারপর আর সন্তান সম্ভাবনার হদিস পায় নি এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিরণ্ময় ঘোষাল। যখন সেই সম্ভাবনার হদিস পেল তখন সুষমা গৃহত্যাগিনী। যদিও কমপাউণ্ডার অতুল রায়ের বয়ানে—

> 'বৌদি তার উত্তরে বলে কিনা, এ নাকি তোমার বীজ, নষ্ট হয়ে যাবে ভয়ে পালিয়ে এসেছে। এখানে নাকি ভীষণ পাপ। পাপে কি বীজ নষ্ট হয়? পাপ যদি পিছন পিছন সারাক্ষণ কাউকে তাড়া করে তখন তারই বা কী করার থাকে।'

গর্ভবতী মেয়েদের গর্ভপাত করানো যে ডাক্তারের আয়ের বিশেষ উৎস, তাকে মানতে পারেনি, সুষমা। আর হিণ্ময়ের সন্দেহবাতিক মন তাকে ক্রমে কোনঠাসা করে তোলে। গল্পটির মধ্যে সাংকেতিকতা অত্যন্ত প্রবল। লাউমাচায় লাউডগা সাপের ঝুলে থাকা, এবং কখনও পাতার রঙে মিশে যাওয়া আসলে মানুষের বর্ণচোরা মানসিকতার প্রতিফলন। অতুল তার সহকারী হয়ে তার সংসারে একসময় মিশেছিল, আবার সুষমাকে সে যখন নিয়ে পালিয়ে যায়, তখন তার ভিন্ন স্বরূপ প্রতিভাত হয়। এই গল্পে ইঁদুরের প্রসঙ্গটিও তাৎপর্যপূর্ণ। হিরণ্ময় মধু ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেছে—'গর্ভাবস্থায় কোন মাসে শিশুর আকৃতি ইঁদুরের মতো হয়? বলতে পারলে না তো। তিন মাস।'

একসময় সুষমার গর্ভের সন্তানটিও ছিল তিন মাসের। আবার নতুনভাবে আজ ফুলির গর্ভের সন্তানও তিনমাস। ফুলির দরজায় গিয়ে হিরণ্ময় তাকে সম্বোধন করছে 'সুষমা' নামে। 'বন্ধ দরজার এপারে হিরণ্ময় অথবা তার ছায়া। একবুক সর্দির ঘড় ঘড় আওয়াজ থেকে বেরিয়ে এলো, সুষমা দরজা খোলো.....' বুঝতে অসুবিধা হয় না অতুলের ভাগিয়ে নিয়ে আসা সুষমা এখানে ফুলি নামে পরিচিতা। আরও একটি লক্ষ্য করার বিষয় গলার 'ঘড় ঘড় আওয়াজ'। গলায় ঘড় ঘড় শব্দ করে বেড়াল। লেখক বোঝালেন, তিনমাসের শিশু ইঁদুরের মতো, তাকে হিরণ্ময়ের বিড়াল সত্তার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আবার অন্য ভাবে বলা যায়, ইঁদুর এর সাংকেতিকতা চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। গর্ভের সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে তাই ঘোর সন্দেহ জাগে হিরণ্ময়ের। ইঁদুর যেমন সকলের অলক্ষে সর্বনাশ করে,

তেমনি সুষমাও হিরন্ময়কে ঠকিয়েছে বলে তার সন্দেহ। বিমল করের 'ইঁদুর' গল্পেও আমরা মানুষের অন্তঃকরণের চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে ইঁদুর সত্তার অপূর্ব সংযোগসূত্র উপলব্ধি করি। মলিনা বাইরের ইঁদুরকে ঘৃণা করলেও অন্তরের ইঁদুর সত্ত্বার থেকে পরিত্রাণ পায় নি। হিরণ্ময় অন্ধকার ডিসপেনসারিতে ইঁদুরের আক্রমণের মাঝে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মাঝে বসে থাকে। হিরণ্ময় কাকেদের সঙ্গম দেখে শিহরিত হয়ে যায়। কিন্তু নিজের সীমাবদ্ধতা জানে। অবার সন্দেহ প্রবণতায় নিজের স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকেও স্বীকার করতে তার অসুবিধা হয়, 'পরের ছেলের বাপ কেই বা হতে চায়'। আসলে এই সবের মধ্য দিয়ে হিরণ্ময়ের একাকিত্ব ও আত্মপীড়নের ইতিবৃত্তিই গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে যায়। আধুনিক জীবন যন্ত্রণার শিকার হিরণ্ময়।

'চক্ষুদান' গল্পে প্রকৃত সত্যকে লুকানোর জন্য সত্যেনের নিজের আত্মপীড়ন মূল বিষয়। এক বছর আগে দুর্গাপ্রতিমার চক্ষুদান করার পর হাতের রঙ ধুতে গিয়ে পুকুরের স্বচ্ছ অথচ গভীর জলে সোনার আংটি পড়ে যায় সত্যেনের। কাজের বৌর ছেলে মানিক সেই সময় গরু নিয়ে ফিরছিল, সত্যেনের কথায় সে জলে নেমে আংটি পেলেও নিজেকে বাঁচাতে পারে না, ক্রমে তলিয়ে যায়। তাকে যখন উদ্ধার করা হয় তখন সে মৃত, কিন্তু আংটিটা তার হাতের মুঠিতে ধরা। একটি মৃত্যুর জন্য দায়ী সত্যেন নিজের ভুল স্বীকার করতে পারেনি। মৃত মানিককে সে বাড়ির লোকেরা চোর আখ্যা দিয়েছিল। দরিদ্র কিশোর চোর বদনাম পাবে এটা যেমন অপেক্ষাকৃত ধনী ও অভিজাতদের কাছে স্বাভাবিক, তেমন অস্বাভাবিক নয় বিবেকবোধ যুক্ত মানুষের আত্মযন্ত্রণা। এই আত্মযন্ত্রণা মানসিক বিকারের জন্ম দেয়। সেখান থেকেই শুরু হয় আত্মপীড়নের অধ্যায়। একবছর পর আবার দুর্গার চক্ষুদান করতে এসে সফল হতে পারে না সত্যেন। স্ত্রী নন্দিতা পাশে দাঁড়ালেও তার হাত কাঁপতে থাকে সত্যগোপনের অপরাধে বিবেকর দংশনের পীড়ায়। পকুরের জলে সে নামতে পারে না। কারণ সে দেখতে পায় মানিক ডুব সাঁতারে জলের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। এই আত্মবিকার থেকে বাঁচার জন্য সে আর বাড়ির দুর্গাপুজোয় যায় না। 'চক্ষুদান বা চোখ আঁকবার জন্য সত্যেনের প্রয়োজন হয় না। এখন প্রতিমা স্বর্ণাচক্ষু।'

আত্মপীড়নের আরও একটি গল্প 'ক্ষরণ'। এই গল্পের কেন্দীয় চরিত্র রীতা তার জীবনের একটি দুর্ঘটনার জন্য স্বভাবত একা হয়ে গেছে। দাদা বৌদির সংসারে তার একমাত্র অক্সিজেন ভাইঝি টিঙ্কু। যদিও সে নিজস্ব একটি ঘরে দাদা বৌদির যথাসম্ভব সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলতেই স্বচ্ছন্দ, তবু তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ভদ্রতার ব্যবহার বজায় রাখে। লেখক রীতার চোখ দিয়েই নিঃসঙ্গ দুপুরের ছবি আঁকেন—

'রীতা ঘরে এসে জানালা বন্ধ করে দেয়। দক্ষিণায়নে সূর্য, রোদ ঢুকে পড়বে। তখন সে আকাশে দেখে এক ঝাঁক শকুন আরো দ্রত নেমে আসছে। এখন আর বিন্দুর মতো অবয়ব নেই। ডানা সহ উড্ডীয়মান গতি সবাই সে লক্ষ করে। কিন্তু জানালা বন্ধের

পর তার নিঃশ্বাসের গন্ধ যেন সে নিজে বুঝতে পরে, এরকম একা হয়ে চুলটা খুলে উড়িয়ে দিতে গিয়ে বোঝে, এখনও ভেজা আছে।'

নির্জন দুপুরের অখন্ড অবসরে ছাতে রীতার শাড়ি মেলা, গুছিয়ে আনা, কাক ও শকুনের সন্দেহজনক উপস্থিতি লক্ষ্য করা, ঘরের খুব কাছে আমবাগানের শর্টকাট রাস্তার দিকে অযাচিত চাউনি, পীড়িত স্মৃতির দ্বারা আক্রান্ত হওয়া এবং উদাসীনতা দেখানো, সবই লেখক নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত করেন। রিতা সবই দেখে কিন্তু তার মধ্যে আত্মমগ্নতা থাকে না। সমস্ত কাজই করে কিন্তু তার মধ্যে শুধু কর্তব্যপরায়ণতা থাকে। তাব বৌদি গায়ত্রী যখন ঘরের আদূরে আমবাগানের পাশের কোয়ার্টারের বন্ধ ঘরে মৃত লাশের খবর ব্যক্ত করে এবং পচা গন্ধে মুখ বিকৃত করে, রীতা উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু একটু পরে যখন তার দাদার মুখ থেকে শুনতে পায় সাটু, যে তাকে ধর্ষণ করেছিল, এবং তার জেরে ছয় বছরের জেল হয়েছিল, সে আততায়ীর হাতে মারা পড়ে গৃহবন্দী হয়ে আছে, তখন রীতা নিজেকে সামলাতে পারে না। সব প্রতিরোধ যেন তার শেষ হয়ে যায়। বেঁচে থাকার অর্থ সে আর খুঁজে পায় না। প্রতিশোধ স্পৃহার ব্যর্থতায় সে বেছে নেয় আত্মপীড়নের পথ।

> 'চরম এক হতাশায় নিমজ্জিত হতে হতে রীতার কাছে তর বেঁচে থাকাটাই নিরর্থক হয়ে যায়। সে যেন সাটুকে খুন করবার জন্যই বেঁচে ছিল এতদিন। ..... তার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভেঙে গুড়িয়ে একই জায়গায় স্থবির হয়ে যায়। প্রতিটি নিঃশ্বাস পতনের শেষে টাগরার লালার ভেতর থেকে বুকের গভীর শূন্য থেকে হাহাকার উঠে আসে— আঃ। আমার যৌবন নিন্দার, আমার যৌবন লজ্জার।'

এই আত্মপীড়ন অবশেষে নিজের শরীর নিগ্রহের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়। তার মনে হয় তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তারও মৃত্যু হয়ে গেছে অনেক আগে, যেদিন সে ধর্ষিতা হয়েছিল, যেদিন থেকে তার জীবনের সব স্বাদ আহ্লাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল, অন্যের অনুকম্পা নিয়ে তাকে বাঁচতে হয়েছিল। তার বৌদি গায়ত্রী তার ঘরে এসে দেখে—

> 'নখের আঁচড়ে রীতার সমস্ত মুখ রক্তাক্ত। সে তার নিজের স্তন নিজেই আঁকড়ে বসে আছে, তাতে প্রতিটি নখের কেন্দ্রবিন্দু রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে।'

'টুটু এখন হালুম বলছে' গল্পে বেলা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে গল্পকার পীযূষ ভট্টাচার্য নগ্ন বাস্তবের ছবি এঁকেছেন। বারবণিতা বেলা অস্তিত্বের সংগ্রামে নিষিদ্ধ পল্লীতে ঠাঁই পেয়েছে যদিও এখানে তার কাজের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় তারই শিশুটুটু। মাতৃত্বের থেকেও বড়ো হয়ে ওঠে জীবন সংগ্রাম। রাগে দুঃখে অবচেতনের দ্বারা তাড়িত হয়ে সে টুটুর কান্না থামানোর জন্য গালা চেপে ধরে। গল্পকার রুঢ় বাস্তবকে অবলীলায় বোঝাতে চান— 'ঘরে খদ্দের একে কোথায় রাখি? মাটিতে রাখলেই কাঁদছে কন্নার শব্দে খদ্দেরের দাঁড়ায় না, নেতিয়ে পড়ে—'। সাংবাদিক যুবক নিখিলেশ যখন বিকেলবেলা টুটুকে বেড়াতে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নেয় তখন আত্মপীড়নের পথ সহজ হয়ে যায় বেলার। দিনের পর দিন

ঘরে ঢুকে থাকা খদ্দেরর পৈশাচিক অত্যাচার মেনে নেয় বেলা জীবনের স্বার্থে, বা পা পা করে এগিয়ে আসা মৃত্যুর স্বার্থে। ঘরের দরজা ভেঙ্গে যখন দেখা যায় সঙ্গমরত অবস্থায় খদ্দেরের মৃতদেহ এবং মৃতপ্রায় ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত বেলার দেহ তখন জীবনের কদর্য রুপটি সম্পর্কে ভয়াবহ একটি রুপের মুখোমুখি দাঁড়ায় পাঠক। আত্মবিকার ও আত্মবঞ্চনার এই সব কাহিনীতে জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। জীবনকে যেমন, মৃত্যুকেও তেমন নির্বকার চিত্তে বর্ণনা করেন পীযূষ ভট্টাচার্য।

> 'বেলার কি আধো ঘুম ঘুম চোখে তার পরিচিত অপরিচিত পৃথিবীটা বেঁকে যাচ্ছে, সমস্ত পৃথিবী মানুষজন বেঁকে দুমড়ে মুচড়ে ধনুকের মতন হয়ে ছিলায় তূণ ভরে শেষ নিক্ষেপের টান টান হয়ে যাচ্ছে— এখনই যদি নিক্ষেপ সম্পূর্ণ না করা হয় ছিঁড়ে যাবে ছিলা— সমস্ত শরীরটা বেডের সঙ্গে বাঁধা, তথাপি নিজেকে শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলতেই নিখিলেশের মনে হয়, মৃত্যু বুঝি টংকার তুলে এগিয়ে আসছে।'

৭১ এর অস্থির সময়কালে সৈন্যদের সঙ্গে নাগরিকদের অশান্তির পরিবেশে মাছ শিকার ও বিদ্রোহী মানুষের প্রতি বলশালীর হত্যা প্রক্রিয়া সম্পর্কিত ভাবনা নিয়ে গড়ে উঠেছে 'সীমান্ত শেষের যত্রা' গল্পের প্লট। জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে যেন কোনো ভেদরেখা নেই এখানে। বোবা ছেলে জীবনের অসহায় মৃত্যুর পর তার বাবা নগিন ছেলের অস্থি বিসর্জন দিতে নিয়ে চলেছে, লক্ষ্য করার মতো বিষয়, মৃত জীবন তার জীবতাবস্থার মূক সত্ত্বা থেকে বেরিয়ে এসে সবার অলক্ষে কথা বলা ও প্রতিবাদ করার চেষ্ঠা করেছে। নিতান্ত হাভাতে ঘরের মূক জীবন গোরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু এই সামান্য কাজটির ঋণ তাকে নিজের জীবনের দাম দিয়ে মেটাতে হয়। জীবনের মৃত্যু শিরচ্ছেদের দ্বারা হয় এবং এই মৃত্যু নিতান্তই নাগরিকদের প্রতি সেনাদের বীভৎস অত্যাচারের নমুনা।

'কোরবানী' গল্পের কেন্দ্রীয় সুর মৃত্যু, যদিও জীবনের পরিপূর্ণতার সঙ্গে মৃত্যুর সহাবস্থান ও তার গুরুত্ব স্বীকার্য— 'মৃত্যুর মুহূর্তে পৌঁছে যেন জীবন জীবন হয়ে উঠেছে। মৃত্যুকে তো বোঝা যায় না। মেনে নিতে হয়।' এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জন্য মানুষের প্রতীক্ষা না থাকলেও মানসিক প্রস্তুতি থাকে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মজনুর সঙ্গে এখানে একাকার হয়ে যায় ১২০২ খ্রীঃ বক্তিয়ার খিলজি'র গৌড় বাংলা অধিকারের প্রসঙ্গ। মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা, ক্ষমতা ভোগের রাজনীতি মানুষেরই জীবনের অপচয় ঘটায়। কামালের সুস্থতার প্রত্যাশায় কোরবানীর জন্য আনা উটের আর প্রয়োজন হয়না, কারণ সন্ন্যসী বিদ্রোহের আবহে অসুস্থ কামালকে ট্যাক্সিতে থকাকালীন অগ্নি সংযোগ জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। কোনক্রমে রক্ষা পাওয়া বাচ্চু মিয়া জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে দার্শনিকতায় উদ্বেলিত হয় এই ভাবে, এই মাটি থেকে মানুষের সৃষ্টি এবং মাটিতেই তার লয়। পীযূষ ভট্টাচার্য অপূর্ব তাত্বিকতার মধ্য দিয়ে এই অবস্থাকে বিশ্লেষণ করেছেন—

> 'হাসপাতালে বাচ্চু মিয়ার স্যালাইনের ড্রিপে অক্সিজেনের বুদবুদে ঘাত প্রতিঘাত

যেন প্রমাণিত হয়েই চলেছে জীবন ও মৃত্যুর গোলমাল নেই। মানুষ তো জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ নিয়েই জন্মায়। মানুষ যখন প্রথম হয়ে ওঠে তখন কি সে মৃত্যুকেও আবিষ্কার করেছিল? কেননা মানুষ একসময় মৃতের সঙ্গে অস্ত্র কবরে দিয়ে দিত যেন মৃত্যুর পরও যে জীবন অব্যাহত সেখানেও সে লড়াই করতে পারে।'

মানুষ জীবন জুড়ে জাল বুনে চলে। এই জাল মাকড়সার মতো। সেই জালে সে বাঁধা পড়ে থাকে। বেরোনোর কথা ভাবে না। মৃত্যু তাড়িত এই জীবনে, জীবন জটিল ও রহস্যময় জীবনে প্রায়শই দিশেহারা পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পের চরিত্রেরা। তারা জীবন নির্বাহ করে, কিন্তু জীবন যাপন করে না, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত, পর্যুদস্ত। এক পা এগোলে দু'পা পিছোতে হয় তাদের। আত্মযন্ত্রণায় লীন হয়ে যায় তারা। বোধের গভীরে ডুবে নষ্ট শশা পচা চালকুমড়ার মত দেখে এই জগৎকে। তারা মানুষকে হত্যা করে, তবু মৃতের হাত থেকে পরিত্রাণ না পেয়ে, মৃতের সঙ্গে পথ চলে। তারা ভালোবাসতে চায়, তবু হৃদয়ে সুরের যুগল- বন্দিতে সমতা খুঁজে পায় না। সঙ্গমেও সুখ পায় না, প্রার্থিত শরীর যেন ধুলো আর কাদা হয়ে যায়।

'দহ' গল্পে মনিমালার হার ছিনতাই এর দায়ে যে অজ্ঞাত পরিচয় যুবককে গণপিটুনিতে মরতে হল, তার কাছ থেকে উদ্ধার হল না সেই হার। অথচ শিবনাথ মানসিক বিকারে বাড়ির পাশের ফাঁকা প্লটটিতে মৃত ছেলেটির দর্শন পায়। ছিন্নমস্তার লকেট সহ হারটি যদি কোনো দিন উদ্ধার হয় তখন তার গায়ে আজকের বর্বরতার ছাপ না থাকলেও, একটি বর্বর সমাজের ইতিহাস প্রতিভাত হয়ে উঠতে আগামী প্রজন্মের কাছে। পর্টির নেতা রমণীমোহনও এই মৃত্যুলীলা থেকে বাঁচতে পারে না। যেখানে যুবকের মৃতদেহ পড়েছিল,

> 'অবিকল সেরকম একজনকে পড়ে থাকতে দেখে। সে যতই এগিয়ে আসতে থাকে মানুষটা লম্বা হতে শরু করে। এক সময় রাস্তার এপার ওপার হয়ে যায়'

— এটা কোনো ভৌতিক ঘটনা নয়। মনের গভীরে তোলপাড় হয়ে চলা একটি অন্যায় ঘটনার মানসিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। পরাবাস্তববাদী ভাবনা এই ভাবে পীযূষ ভট্টাচর্যের গল্পে ভিন্নমাত্রা এনে দেয়। মনোজগতের বিরাট আন্দোলনে জন্ম নেয় পরাবাস্তবের জগৎ, যা আধুনিক মানুষকে বোধের গভীরে টেনে নিয়ে যায়।

'জ্যোৎস্নালোকে হুইল চেয়ার' গল্পের সূচনা অংশ আকর্ষণীয়—

> 'চাঁদ তো প্রতি মাসেই মরে যায়, আবার বেঁচেও ওঠে ছায়া ছড়িয়ে নতুন ভাবে। প্রতিনিয়ত নিজের ল্যাজ নিজেই কামড়ে অন্তিম প্রয়াসের মধ্যে এক সময়ে আজকের মতন এরকম একটা পরিপূর্ণ চাঁদও প্রবীণ রাত্রির অকাশে ওঠে। জ্যোৎস্নায় স্তম্ভিত সৌন্দর্যের মধ্যে লক্ষ্য একটি সাপ শরীর থেকে খোলস ছাড়াচ্ছে জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে আর জ্যোৎস্না ক্রমান্বয়ে পিছলে যাচ্ছে সরীসৃপ শরীরে'

এই বর্ণনা আসলে কবিতার আদলে গল্প বলার সূচনা যেন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রায় সাড়ে পাঁচশ' শব্দের মধ্যে একটি অত্যন্ত গভীর সংবেদনপূর্ণ গল্প এটি। পীযূষ ভট্টাচার্য

অত্যন্ত পরিমাপ করে শব্দ ব্যবহার করেন। সেই শব্দগুলি প্রায়শই কাব্যগন্ধী সাংকেতিকতা নিয়ে হাজির হয়। বিমল করের 'শীতের মাঠ' গল্পে পঙ্গু অসহায় নবেন্দু সারাদিন শীতের মাঠ মুখ করে বসে থাকে এবং সংসার চালানোর জন্য চাকরি নেওয়া স্ত্রী অতসীর প্রতি মানসিক অবসাদ জনিত কারণে সন্দেহাতুর হয়ে ওঠে। পিযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে উত্তম পুরুষে কথক তার অনুভব এবং অনুভূতির প্রাখর্য বর্ণনা করেছে। ধর্ষকদের হাত থেকে নিজের স্ত্রী দোলনকে বাঁচাতে গিয়ে কথক অহত হয় চলৎশক্তিহীন অবস্থায় হুইলচেয়ারে আশ্রয় নিয়েছে। অফিসে যে চেয়ারে সে বসত আজ সেই চেয়ারে বসে দোলন। আক্রান্ত হবার দিন দোলনকে আত্মরক্ষা করার জন্য পালানোর পরামর্শ দেয় কথক। আজ মনের সেই সন্দেহের মেঘ দানা বাঁধে— দোলন কি পালাতে পেরেছিল, সিঁড়ির ঘরের গোপনে কি আশ্রয় নিতে পেরেছিল, না কি ধর্ষিতা হয়েছিল, যা আজও অজানা। অখন্ড অবসরে এই সব চিন্তারাশি আসলে কথককে সন্দেহাতুর করে তোলে। এই সন্দেহ তার মনে গভীর অবসাদ ও মৃত্যু ভাবনা এনে দেয়। তার পঙ্গুত্ব স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্যেও ভেদ রেখা টেনে দিয়েছে—

> 'মৃত্যুর অশরীরের গন্ধের ভিতর দিন বেশ কেটে যাচ্ছে। যদিও আমরা একই ঘরে থাকি তথাপি ঘুমের ভিতর দোলনের মুখ ভেসে ওঠে— দোলনের কাছ অবধি এই হুইলচেয়ার পৌছতে পারে না। শুধু দেখি মশারির জালের ভিতর ধরা অসহায় মুদ্রাতে দোলনের শরীর স্থির। যেন এক জাল ছিঁড়ে জন্ম নিচ্ছে নাও অন্য কোনো এক জাল তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

স্বপ্নের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রীর দুরত্ব ঘুচতে চায় না। পরাবাস্তববাদী কল্পনায় জীবনটাকে জালে আবদ্ধ একটি অবস্থা বলে অনুভূত হয়।

পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে কাহিনীর ঘনঘটা নেই। বরং বলা চলে অবচেতনে উঠে আসা শব্দরাশির পিছন চলে আসে খন্ড খন্ড ঘটনার আবহ। তার গল্পগুলি প্রায় সবকটিই মানস্তাত্বিক। তাই হুইলচেয়ারে উপবিষ্ট কথক মনে করে সে সর্বদাই আততায়ী পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। চিন্তার জটিলতায় স্ত্রী দোলনের সান্নিধ্যে উন্মুখ পিপাসার্ত হৃদয় অন্ধকারকে আততায়ী মনে করে। দোলনকে আকড়ে ধরে ধরে বেঁচে থাকার সুখ কথকের কাছে স্বপ্নময় গভীর প্রত্যাশা নিয়ে আসে।

'পচন প্রক্রিয়া' গল্পেও পরাবাস্তবতার দুরুহ প্রভাব ধর্মীয় গোঁড়ামির রেশ ধরে জাহানারা ওরফে নিবেদিতার জীবনকে জটিল করে তুলেছে। জাহানারা ধর্মীয় অচলায়তন থেকে বেরিয়ে হিন্দুপাত্র সুকমল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিবাহ করে। শুধু তাই নয় একটি ধর্মের গোড়ামি থেকে বেরিয়ে এসে অপরধর্মে যাগযজ্ঞ পূজার্চ্চনা করে নিজেকে চরম হিন্দু বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে নিবেদিতা নাম গ্রহণ করে। কিন্তু তার মনে হয় মায়া ও রমা বৌদির মত হিন্দু এবং অন্যান্য অনেক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের কন্যা তিন্নি ও

পরিবারের ক্ষতিসাধন করতে এগিয়ে আসছে প্রতিনিয়ত। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রেক্ষিতে সুকমলদের মাছভরা পুকুরে বিষ ফেলে কেউবা প্রতিশোধ নিতে চায়। পুকুরে সব মাছ মরে ভেসে ওঠে সকাল বেলায়। নিবেদিতার ধর্মভীরু মন শুধু মাছ পচে যাওয়ার জন্য নয়, সমাজের পচন প্রক্রিয়ায় অজানা আশঙ্কায় শিহরিত হয়ে ওঠে। কেউ না পেলেও মরা মাছের গন্ধ নিবেদিতার চেতনায় সঞ্চারিত হয়ে যায়।

পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে মনোজগতের নানান রেখাচিত্র ফুটে উঠলেও আত্মনিগ্রহ ও বিকারের জটিল আর্বত ঘনায়মান হয়ে উঠলেও কিংবা পরাবাস্তব জগতের আলো অন্ধকারের ছায়ায় জীবন অদ্ভুত রহস্যময় হয়ে দেখা দিলেও বাস্তবের ভূমি অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা থাকে। পূনর্ভবা-টাঙ্গন-আত্রাই বিধৌত বালুরঘাটের মফস্বল শহর ও গ্রামের প্রকৃতি চিত্রন, মানুষের জীবন নির্বাহের ভিন্নস্তর তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। খুব সামনে থেকে মানুষদের তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, দেখেছেন তাদের যাপনচিত্রের শিকড় কতটা প্রেথিত হয়ে আছে। তাঁর কথায়—

> 'এভাবেই পৌঁছোতে চাই শিকড়ে। সব জীবনই তো দুঃখের। ভালোবাসাও দুঃখেরই। বলা যেতে পারে এ সত্যিকারের বেঁচে থাকার দুঃখ। পরজন্ম নিয়ে কোনো মাথাব্যাথা নেই। কেননা এজন্মেই তো বার বার জন্ম নিতে হচ্ছে।'
> ('ভুমিকার পরিবর্তে', নির্বাচিত গল্প)

এই শিকড়ের সন্ধান নিতে গিয়ে তিনি দেখেন মানুষের বৃক্তিগত ভিন্নতা বুদ্ধিগত স্বাতন্ত্র্য, বিশ্বাসগত অখন্ডতা কিভাবে মানুষের চরিত্রকে নির্মাণ করে। তাঁর গল্পে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক-অধ্যাপক, চাকুরে যেমন তাঁর গল্পে বিশেষ চরিত্রে আসীন, তেমনি নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত চরিত্র, মাঝি, জেলে, গোরু পাচারকারী, চোরাই মাল পাচারকারী, তান্ত্রিক, ছোট ব্যবসায়ী প্রভৃতি চরিত্রে গল্পের মোটিফের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিভিন্ন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। তার গল্পে বার বার মাছ ধরার প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে আসে। বর্ষা বিধৌত, নদী-নালার জল ও কাদার গন্ধ ভরা বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে চরিত্রগুলি সামনে দাঁড়ায়। তাদের ভষা আচরণ প্রবণতায় ফুটে ওঠে সঠিক আঞ্চলিক সততা।

'মাছ' গল্পে শচী, নিত্য, রতন মাছ শিকারী এবং তাদের পেশা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায়। নিত্যর সহোদর সখীচরণ নিত্যকে নিজের প্রয়োজনে লাগানোর জন্য বেশি টাকার লোভ দেখালেও সে তাতে সায় দেয় না, নিজের আদিম প্রবিৃত্তির মধ্যেই সুখী থাকতে চায়। গল্পের সূচনাংশে লেখক বর্ণনা করেন তাদের মাছ ধরার বিশেষত্ব—

> 'পদ্ধতিগত আপত্তি থাকা সত্বেও সে দেড়ফুটের মতন বাঁশের খন্ডটি ছুঁড়ে দেয়, তারপর তারই উপর জাল ফেলে। এই পদ্ধতির প্রথাগত নাম 'বাজফেলা'।'

নিপুণ চোখে গল্পকার তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে মাছধরার পদ্ধতিও বর্ণনা করেন। কখনও মাছের আঁশটে গন্ধযুক্ত গাছ মাইচ্ছান্দির কথা বলেন। এসবের মধ্য দিয়ে খুব

সামনে থেকে দেখা মানুষের জীবনের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা প্রতিভাত হয়। এই সব মানুষেব জীবনের দুঃখকথা, আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি, স্বপ্ন ও ব্যর্থতা নৈর্ব্যক্তিকভাবে লেখক বর্ণনা করেলেও তার মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে থাকে তাঁর সহমর্মিতা। নিত্য শচীর কথার উত্তর প্রত্যুত্তর লক্ষণীয়—

'সম্বন্ধি তুই নিশ্চয়ই কাল রাত্রিরে শান্তির সাথে শুইছিলি। শান্তির সেন্টের গন্ধে তোর মাথা বিগড়ে গেছে। শান্তিই একমাত্র ওষুধ যা শচীকে থামাতে পারে। শান্তি শচীর বউ। এখন লাইনের।'

নির্মম এই বর্ণনায় যেমন আবেগের অপমৃত্য দেখানো হয়েছে, তেমনি জীবনের প্রতি অনুরাগ, বৃত্তির প্রতি দুর্বলতা অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিকভাবে পীযূষবাবু বর্ণনা করেন নিত্যর চোখ দিয়ে—

'কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য সে জেলে নয়। মাছদের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা এমন কি তাদের মারবার পরও সে তাদের প্রতি মমত্ব বোধ করে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই এদের মারতে হয়। এই নিয়ম, নিয়ম পালনই জীবিকা। কেউ নাকেউ, কাউকে না কাউকে, কোনো না কোনোভাবে হত্যা করে চলেছে।'

শেষোক্ত লাইনে জীবনের গভীর তত্ব ও দার্শনিকতা গল্পটিকে এনে দেয় ভিন্ন মাত্রা। আমরা প্রত্যেকেই ব্যবহৃত হচ্ছি আবার ব্যবহার করছি করোকে না করোকে। আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে হত্যা করে চলেছি কারোকে বা নিজেই হত হয়ে চলেছি প্রতিনিয়ত।

'ছোঁয়া বড়শি গল্পে একাত্তরের যুদ্ধের স্মৃতি, জগৎ এর আহত অবস্থায় দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকা, সন্তানের জন্ম দেওয়ার সামর্থ হারানো কিন্তু নিজের স্ত্রীকে জোর করে আধিকার করার পশুত্ব এসবের সঙ্গে মিশে গেছে ছোঁয়া বঁড়শিতে মাছ শিকারের সময় জীবনমৃত্যুর টানাপোড়েন।

'শক্ত হাতে না ধরলে মাছ বল মাছ, মেয়েমানুষ বল মেয়েমানুষ, কিচ্ছু ঠিক থাকে না।'

এই বাস্তবতা সমৃদ্ধ বাচন গল্পটির কেন্দীয় সুর হয়ে যায়। মাছের সঙ্গে দ্বৈরথে জগৎ অবশেষে জীবন ফিরে পায় এবং জয়ী হয় ঠিকই, তবু তার মানসিক বিশ্বাস জন্মায় অপঘাতে মরা তার স্ত্রী সরমাই তাকে জলে ডুবিয়ে মারতে চাইছে।

সম্পর্কের অবনতি, বিশ্বাসের অপমৃত্যু পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে বার বার ফিরে আসে। জগৎ ও সরমার সম্পর্কও সন্তান কামনায় অবনতি প্রাপ্ত হয়। জগতের সন্তানদানে অক্ষমতা থাকলেও সরমা নিজেকে বাঁজা প্রমাণ করতে চায় না, সুতরাং সম্পর্কের শৃঙ্খল ভেঙে যায় এক লহমায়। 'মধুবনী' গল্পে অর্ণব ও ইতুর সম্পর্কের মধ্যেও যেন বিশ্বাসের গভীর বন্ধন কিছুতেই তৈরি হয় না।

চোরাচালানকারীর গোপন বৃত্তি 'স্বর্ণময়ী' গল্পটিতে নতুনত্ব দান করেছে। দুলাল এখানে এজেন্ট এবং তার হয়ে কাজ করছে অতসী নামের একটি কুমারী মেয়ে। সীমান্তপারে একটি স্বর্ণখন্ডকে চালান করার জন্য দুলাল একটি নতুন উপায় বের করে। বাপ মরা মেয়ে অতসীর গোপনাঙ্গে স্বর্ণখন্ডটি লুকিয়ে অসুস্থ নারী সাজিয়ে চোরা চালানের ব্যবস্থা করে সে। নারী রক্ষা সমিতির শোভাদিরা নারী রক্ষার যে কাজ করে তাতে সত্যিই নারী উদ্ধার পায় কি, না পুরো প্রক্রিয়াটি নাম কেনা ও নিজের আখের গোছানোর উপায় তা প্রশ্নের মুখে পড়ে। এই ঘটনায় পর দুলালের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ হয় অতসীর। নিজের জীবন নিয়ে প্রতিবাদের ভিন্নতর পথ ধরে সে, যা সতত বেদনাদায়ক। অতসী বিবাহিতা না হয়েও শাঁখা সিঁদুর পরতে থাকে। 'অতসী ভাবে স্বর্ণখন্ডটি কোনো পুরুষের, সে তাকে বিয়ে করেছে যা নর-নারীই করে থাকে।' বিশ্বাসভঙ্গতার ছবি মাছ গল্পেও আমরা আলোচনা করেছি ইতিপূর্বে, শচীর স্ত্রী শান্তি লাইনের মেয়ে হয়ে গেলেও শচী তার কাছে ফিরে আসে বারবার। কিন্তু ভাঙ্গা সম্পর্ক জোড়া লাগে না। সেন্টের গন্ধের সঙ্গে মাছের আঁশটে গন্ধের সমতা রচিত হয় না। তবু লেখক তার জন্য অপেক্ষা করেন না, দৃষ্টিকে অন্যত্র নিবদ্ধ করেন। এই নৈর্ব্যক্তিকতা লেখকের অভিনবত্ব।

এ সবের বাইরেও পীযূষ ভট্টাচার্য মানুষের কামনা বাসনা সংস্কার বিশ্বাস নিয়েও গল্প রচনা করেছেন। 'গারসি সংক্রান্তির কাক', 'দন্ড কলসের ফুল' 'ভাসান' প্রভৃতি গল্পে গ্রামীণ জীবনের সরলতা অন্ধসংস্কার দেশজ লোকাচার বিশেষভাবে মাত্রা পেয়েছে।

প্রথম পদক্ষেপ যদি স্বর্গে, দ্বিতীয়টি মর্ত্যে, গারসির কাক এক পা দু'পা করে পাঁচিলের উপর হেঁটে আসছে ।' যে ত্রিকালদর্শী কাক জলবিষুব সংক্রান্তিতে পূর্বপরুষদের দেওয়া ঘী-ভাত খেয়ে যায়, তাকে নিয়ে মানুষের এই বিশ্বাস এখানে দৃঢ়। এছাড়াও বন্য গাছগাছালির দ্বারা রোগ নিরাময়ের বিষয়টি দেশজ লোকাচারের মাধ্যমে লেখক বর্ণনা করেছেন।

'দন্ড কলসের ফুল' গল্পে গ্রামীণ জড়ি বুটির বিশ্বাস ও আধুনিক এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। বিমল ও চিনুর একমাত্র সন্তান বাবলু সর্পাঘাতে মারা যাবার আগে পিসিমার দন্ডকলসের পাতা ও মূল বাটা দিয়ে বাঁচানোর সম্ভব ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহ জাগে কলেজের অধ্যাপক বিমলেরও। কেননা অ্যান্টিভেনামের ইনজেকশান হাসপাতালে না থাকায় এবং চিকিৎসার গাফিলতিতে বংশের প্রদীপ বাবুলের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ জড়িবুটির প্রতি অসহায় আত্মসর্ম্পণের দুর্বলতা প্রকাশিত।

'ভাসান' গল্পে দেখা যায় গ্রামীণ পূজা ও সংস্কারের ভিন্নরুপ। চোদ্দ হাত কালী, চোদ্দ হাত মহাদেবের ভাসান। পূজোর দিনের থেকে ভাসানের মহাত্মই বেশি। একশ ত্রিশটি বলি'র মাধ্যমে দেবীকে সন্তুষ্ট করার লোকবিশ্বাস এখানে প্রকাশ পেয়েছে। এর

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অরও কয়েকটি বিশ্বাস। স্বয়ং মেলার দেবী কোন এক পুরাকালে এখানে শাঁখরির কাছে তার সব হাতে শাঁখা পরেছিল। এয়োদের আজকের রাতে শাঁখা পরাটা পুণ্যের, 'সধবার সাধের রাত্রি'। বিনি এই বিশ্বাসে বহরমপুরের হাতির দাঁতের শাঁখা পরে। এই মিথের পাশাপাশি আরও একটি বিশ্বাসের কথা প্রকাশিত, ভাসানের পর সন্তানকামী স্বামী-স্ত্রীরা স্নান করে এসে ভিজে কাপড়ে যদি মিলিত হয় তবে তারা সন্তান লাভ করে। লেখক অপূর্ব কৌশলে তা বর্ণনা করেছেন— 'সব মানুষই বোঝে, কোন কিছুকে তাকে ভালবাসতে হবে। ভালবাসতে এবং ভালবাসা পেতে, নিজের মুখ নিজেই দেখতে চায়। ভাসানের পর তাকে ও বিনিকে ভেজা কাপড়ে উঠে এসেই ভালোবাসতে হবে। এই নিয়ম, এই প্রচীন রীতি, কিংবদন্তি, কেউ নাকি বিমুখ হয় নি। কিন্তু এই বিশ্বাস বোধে শিক্ষিত যুবক যুবতী বিভাস ও বিনি আরও বেশি করে নিজেদের সান্নিধ্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। ওষুধ ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেও বড়ো হয়ে ওঠে আত্মবিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রচেষ্টা। লেখক এখানে 'ভালোবাসতে হবে' শব্দটি এত মোহময় ও কামনামদির করে তুললেন যে শৃঙ্গার বা সঙ্গম শব্দের মধ্যে দিয়ে তা উপলব্ধ হোত না। এখানেই পীযূষ ভট্টাচার্যের অভিনবত্ব।

পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প উপন্যাসের বিষয় সম্পূর্ণভাবে জীবননির্ভর। যে জীবন মাঝিমাল্লা ভবঘুরে চোরাচালানকারী, শিক্ষক, পুলিশ, আইনজ্ঞ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সূত্র ধরে আসলে নিজেকে জানার প্রস্তুতিমাত্র। কারণ লেখক তার চরিত্রের সঙ্গে সর্বদা লিপ্ত থাকেন। নির্বাচিত গল্পের শেষ গল্প 'পটগাথা'র শেষতম বাক্যে লেখক অভিন্ন মানবতাকে ধরার চেষ্টা করেছেন—'তবে কী মানুষ পৌঁছে যায় এক এক সময় এই আনুভূতিতে তখন অপরের সঙ্গে ভেদাভেদ থাকে না, অভিন্ন জীবনের এপিঠ ওপিঠ।' তাঁর আঁকা চরিত্র তাঁরই মনোদর্শনের ছয়ায় গ্রন্থিভূক্ত। নানা চরিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে নানা পরীক্ষা নিরিক্ষায় ব্রতী হয়ে আসলে লেখক জীবনের সারৎসার টুকুর সন্ধান করেন। তাই কখনোই তাঁর নিজেকে জানার প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটেনা। এই আত্মমগ্নতাই সাহিত্যের কাছে লেখকের দায়বদ্ধতা ও নিজের সৎ থাকার প্রবণতা। তাই প্রতিনিয়ত ঘটে চলা হনন প্রক্রিয়ায় মানুষ অসহায়। শারীরিক বা মানসিক ভাবে মানুষ রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলেছে। মানুষ হিসাবে তার দায়তো সবার। রক্তাক্ত সময়ের কাছে তাই আত্মসমর্পণ না করে ইতিবাচক চিন্তায় সেখান থেকে বেরিয়ে আসাই এবং সকলকে উদ্ধার করাই মানুষ্যত্বের লক্ষণ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমীর 'শান্তি সাহা স্মারক পুরস্কার' প্রাপকের অভিভাষণে পীযূষ ভট্টাচার্য তাই নির্দ্বিধায় বলেন—

'রক্তময় শরীরে কেন মৃতবৎ থেকে যওয়া? এই প্রশ্নে সেদিনও যেমন তাড়িত ছিলাম আজ সমানভাবে তাড়িত। এই তাড়নাতেই আটের দশকের শুরুতে কথাসাহিত্যে চলে আসা এবং অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে প্রায় ত্রিশবছর পার করে দিয়েছি। কখন বুঝতেই পারিনি। আদতে কথাকার হতে চেয়েও হয়ে উঠেছি এক আর্তমানুষ—

লেখাগুলি শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজেকেই জানতে চাওয়া।' লেখক আশাবাদী কিন্তু তার পিছনে কোনো চালাকি বা মিথ্যে মনোরঞ্জনের আশ্রয় নেন না। অত্যন্ত নিম্ন স্বরে তাঁর বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেন, তা আটপৌরে হয়েও আভিজাত। ব্যক্তিগত স্বপ্ন হয়েও সার্বিক শান্তদায়ক। সহজ সরল গ্রাম্যতা ও প্রাকৃতিক সমৃদ্ধির কমনা করলেও আধুনিকতার অনিবার্যতাকে অস্বীকার করেন না। আত্রাইয়ের নাব্যতা ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আছি। ময়ূরপঙ্খী নৌকা ভেসে যাবে। নদীর প্রতিটি বাঁকের ঘূর্ণির প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্য মাঝিরা মশানকালী বা সত্যপীরের গান গেয়ে উঠবে। নদীপথের পাশে থাকুক না আধুনিক রাস্তা। ছুটে যায় সভ্যতার দ্রততম যান। অসম্ভব এক মেল বন্ধনের কথা ভাবি সবসময়।' কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁর 'সংহতি' কবিতায় বৈচিত্র্যর মধ্যে মেলবন্ধনের কামনা করেছিলেন—

'ঝড়ো হওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।।'

এই অসম্ভব কল্পনায় মেলবন্ধন স্বপ্ন কামনাতেই একজন স্রষ্টা সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যান।

পীযূষ ভট্টাচার্যের 'কীর্তিমুখ' : সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে

রূপদত্তা রায়

'তরাইয়ের মেঘ গলিত ধাতুর মত সগর্জন নেমে প্রতিমা ছাঁচে পড়ে স্বর্ণমূর্তি হয়ে যায় হেমন্ত। পর্ণমোচী বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়াতেই মনে হয়, পরিযায়ী পাখিদের আসবার সময় হয়ে গেছে। এমন এমন গ্রাম আছে যেখানে প্রতিটি গৃহেই পাওয়া যাবে দোতারা। রাস্তার দুধারে চলতে চলতে ইচ্ছার পতাকা ন্যাকরাকালী বা পিরের বৃক্ষে লটকে দিতে পারি। আমাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ 'হালুয়া' বলে 'হালুয়ানি' শোনে। মুখোশ পড়া জোড়াবলদ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে জানাতে অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে মুদ্রা পালার মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে ঝিমুতে থাকে। দুঃখের কাহন আর কত? তখন নিজের ভিতর আড়বাঁশি আর্তনাদ করে ওঠে, প্রতিবাদ কোথায়? কোনও কোনও প্রতিবাদ আত্মপ্রতিষ্ঠার নামান্তর মাত্র, জানি। কিন্তু এতদিনে খাঁপুরের তেভাগার শহিদ যশোদারানি মা হয়ে গেছেন।

সময়ে তো এভাবেই হয়। তবে কি আমরা নিরক্ষরেখার বাইরে?

লেখাও এভাবেই হয় এভাবেই পৌঁছাতে চাই শিকড়ে। সব জীবনই তো দুঃখের। ভালবাসাও দুঃখেরই। বলা যেতে পারে এ সত্যিকারের বেঁচে থাকার দুঃখ। পরজন্ম নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। কেননা এ জন্মেই তো বার বার করে জন্ম নিতে হচ্ছে। এ জন্ম নেওয়ার মধ্যে আছে যতটা তেজ তার চেয়ে বেশি কষ্ট। তার জন্যই শব্দের সীমানা ছাড়িয়ে শব্দ শোনাবার দায় থেকে গেছে জীবনে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রমূল আঁকড়ে থাকাটা কষ্টের বই কী! এর জন্য আকড়ে থাকার কৌশল বার করতে হয়। এ এক অদ্ভুত ব্রতচারণ, কেননা ব্রতচারণের উদ্দেশ্য তো মানুষে পরিণত হওয়া।'' (পৃ. ১৭/উত্তরভাষা পত্রিকা/পীযূষ ভট্টাচার্য)

'আত্রেয়ীর তীর ধরে ফেরা বাচকের ভমিকায়' শিরোনামে কথাকার পীযূষ ভট্টাচার্য এভাবে তাঁর নিজের লেখালেখির প্রেক্ষাপট উন্মোচন করেন। নিবিড় অনুভূতিসিক্ত এই উচ্চারণে প্রকাশ পেয়ে যায় তাঁর লেখার বিষয়বস্তু কী বা কারা, তাঁর লিখনশৈলী কেমন আর অবশ্যই লেখক হিসেবে তাঁর দায় কী? আধুনিকতার চোরাবালি আর আধুনিকোত্তরবাদের সর্বগ্রাসী করাল থাবা এড়িয়ে এই কথাকার তাঁর লেখায় ঘটান প্রাকৃতায়ন। লোকবিশ্বাস, মিথ তাঁর লেখায় যেমন আসে, তেমনি তাঁর অন্বিষ্ট মানুষগুলিও ভূমি সংলগ্ন। কথাসাহিত্যে পদার্পণের আগে তিনি প্রায় একদশক কবিতা চর্চা করেছেন। তাঁর গদ্যের ভাষা তাই অনুভূতিঘন, কাব্যের স্পর্শে গীতিময়। মুখোশ পরা জোড়াবলদের সম্মতিসূচক মাথা নাড়ার ক্লান্তি নজরে আসে, চোখে পড়ে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরও। কিন্তু তারপর? তারপরও তো স্বপ্নভঙ্গ। তাই শব্দের সীমানা ছাড়িয়ে শব্দ শোনানোর গুরুভার তিনি তাঁর লেখকজীবনের দায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এ সংগ্রামে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা খুব একটা পাওয়ার কথা নয়, ফলে পীযূষ ভট্টাচার্য মূলত লিটিল ম্যাগাজিনের লেখক। তাঁর লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র প্রকাশনী থেকে। আর তাই তাঁর লেখা খুব সহজলভ্যও নয়। অথচ ইতিমধ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে 'জীবিসঞ্চার', 'নিরক্ষরেখার বাইরে', 'তালপাতার ঠাকুমা' ও 'সূর্য যখন মেষ রাশিতে' নামে চারটি উপন্যাস আর 'কুশপুত্তলিকা', 'পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প', 'কীর্তিমুখ', 'পদযাত্রায় একজন' ইত্যাদি দশের বেশি গল্পগ্রন্থ। এছাড়া লিটিল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত তার আরো বেশ কিছু ছোটগল্প ও উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

স্বাধীনতার আগের বছর জন্ম নেওয়া এই কথাকারের লেখালেখির জগতে আসা প্রায় ৩৫ বছর বয়সে। ''কোণঠাসা অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে খুঁজতে'' তাঁর লেখার জগতে চলে আসা বলে পীযূষ জানিয়েছেন 'উত্তরভাষা' পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সেই দুর্বিসহ অবস্থার কারণ ছিল রাজনৈতিক। কেবল ট্রেড ইউনিয়ন করার জন্য প্রমোশন বন্ধ, ফলে পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে পার্ট-টাইম

কাজ। সেই দমবন্ধ পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্যেই তাঁরলেখালেখি এবং কথাসাহিত্যে প্রবেশ। বিশ শতকের ষাট-সত্তর দশকের উত্তাল পরিধি পার করে এস আশি-নব্বই-এর দশক ছিল আপাতত শান্তি-কল্যাণের সময়। কিন্তু সে সময় ছিল স্বপ্নভঙ্গেরও। যে রাজনৈতিক আদর্শ আর স্বপ্নকে সামনে রেখে এক প্রজন্ম তার জীবন-যৌবন বাজি রেখেছিল, আশির দশকে পৌঁছতে না পৌঁছতে দেখা গেল সব স্বপ্নই মিথ্যা, জীবনের অমূল্য সময় কেবল অপচয় হয়ে গেছে, আর রাজনৈতিক আদর্শ দাঁড়িয়ে আছে প্রশ্নচিহ্নের সামনে। একজন সচেতন মানুষ হিসেবে এবং সংবেদনশীল কথাকার হিসেবে রাজনৈতিক সমাজে এই বিচিত্র কৌণিকতা তাঁর নজর এড়ায়নি। ফলে ব্যক্তি ও পৌরসমাজে রাজনৈতিক সময়ের টানাপোড়েনের অনুষঙ্গ তাঁর লেখায় প্রকাশিত হয়। কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে খুব সরাসরি প্রতিবাদ গড়ে তোলার প্রায়াসও তিনি করেন না। সত্য দেখানো তাঁর কাজ, অথচ চেঁচিয়ে বলা তাঁর ধরণ নয়। ভাষায় থাকা কাব্যধর্মীতা যে কোনো ভয়ঙ্করকেও সহনীয় করে দেয় সত্য। কিন্তু তার আবেদনটি সরাসরি পৌঁছে যায় মস্তিষ্কে। আবার সেজন্যে হয়তো দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আসে তাঁর লেখার প্রতি। তাঁর গল্প যেন জীবনের জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে একাকী হয়ে যাওয়া। এত কথা আসে পীযূষ ভট্টাচার্যের 'কীর্তিমুখ' (২০০১) পাঠের প্রতিক্রিয়া হিসেবে গল্পগ্রন্থটি পাঠকের মনেও যেন 'স্বপ্ন নয় - শান্তি নয় - ভালোবাসা নয়, হৃদয়ের মাঝে এক বোধ'-এর জন্ম দেয়। সজহ লোকের মতো আর চলা যায় না তখন, উপেক্ষা করতে চাইলে অথবা মড়ার খুলির মতো ধরে আছাড় মারতে চাইলেও সেই বোধ জীবন্ত মাথার মধ্যে ঘোরে।

গল্পগ্রন্থটির প্রথম নামগল্প 'কীর্তিমুখ'। কীর্তিমুখ হল স্কন্ধপুরাণে উল্লিখিত এক সিংহাকার দানব। শিবের রাগ থেকে তার জন্ম, শিবের আদেশে ক্ষুধা নিবারণের জন্যে নিজের সম্পূর্ণ দেহ সে খেয়ে নেয়, রয়ে যায় কেবল মাথা। শিব প্রসন্ন হয়ে নিজের মন্দির দ্বারে তার স্থান দেন এবং নাম দেন কীর্তিমুখ। গল্পের নামের এই অর্থ গল্পটিকে অনেকার্থদ্যোতক করে তুলেছে। শান্তনু রাজনৈতিক দলের নির্দেশে একটি হত্যা করে। এই হত্যাও খুব পরিকল্পিত ছিল না। অ্যাকশন গ্রুপের নেতা শান্তনু 'মার অথবা মর' অবস্থায় যোগ্যতম প্রমাণিত হয়। কিন্তু তার ফলে জীবনের দশটা বছর কেটে যায় জেলে। বদলে গেছে সময়, বদলে গেছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বদলে গেছে পারিবারিক সম্পর্কও যেন। দশবছরের ব্যবধানে অনেক কাছের মানুষ মালা গলায় ছবি হয়ে গেছে, ছোট দোকান-ছোট রাস্তার গায়ে উন্নতির ছাপ। রাজনৈতিক আদর্শের পালাবদল গল্পকারের ভাষায়....

''তখনও শান্তনুর ''এটা কি কেবল ব্যক্তিহত্যা?'' এ প্রশ্নের উত্তরে নকুলদার উত্তর ছিল। এক সময় এই প্রশ্নের উত্তর নকুলদা না দিয়ে এমন এক জায়গায় দৃষ্টি স্থাপিত করত সেখানে শুধু অতীত।'' (পৃ. ১১/কীর্তিমুখ)

জেলে পার্টির নেতা, সদস্য, এমনকি স্ত্রী গীতিও একসময় দেখা করতে যাওয়া

বন্ধ করেছে, তাই শান্তনুর জেল থেকে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ছাড়া পাওয়ার খবর কেউ পায় না। খবর পেলেও কোনো মিছিল, উৎসব, জয়ধ্বনি হত না— এ বলাই বাহুল্য। কারণ একসময়ের শ্রেণিশত্রু বর্তমানের সহযোগী যোদ্ধা। তাই শান্তনুর বাড়িতে থাকা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়। আর পারিবারিক সম্পর্কও যে বদলে গেছে তা ভীষণ সংক্ষিপ্ত অথচ অনেকার্থদ্যোতক বয়ানে কথাকার তুলে ধরেন....

''শান্তনু জেলে যাওয়ার পর এ ঘরের পাশে আরও একটি ঘর হয়েছে। যেন ঘরের মধ্যে ঘর অন্যঘর অন্যতর জীবন যা চাঁদের মতন প্রতিমাসে মরে যায় আবার বেঁচে ওঠে। মাত্র কয়েকদিনের মৃত্যুতে কিছু কি হেরফের হয় চাঁদের। সে তো স্বমহিমায় ফিরে আসতে পারে আবার। গীতি বলবার আগেই সে বলে ওঠে— গ্রামের বাড়িতে চলে যাই। ''বাবা মারা যাওয়ার পর তো তালা বন্ধ'' গীতির উদাসীন কথার উত্তরে শান্তনু শুধু বলতে পেরেছিল— ''বেদখল তো হয়নি''। (পৃ. ১৪/কীর্তিমুখ)

চাঁদের মতোই স্বমহিমায় পারিবারিক জীবনে ফিরে আসার ইচ্ছেতেই হয়তো শান্তনু গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা তুলেছিল। হয়তো সে আশা করেছিল গীতি একথার প্রতিবাদ করবে, ধরে রাখতে চাইবে তাকে। কিন্তু তার বিপরীতে গীতির উদাসীন উত্তরে শান্তনুর অনুভব হয়, পরিবার যেন বেদখল হয়ে গেছে। আর তাই গ্রামের বাড়ি যে বেদখল হয়নি— একথার উল্লেখ সে করেছে। শান্তনু জেলে থাকাকালীন নকুলদার সহায়তায় হওয়া গীতির স্কুলের চাকরি তার মনে প্রশ্ন তোলেনি, কিন্তু এবার তার মনে সন্দেহ জেগে ওঠে। তারই ফলে গ্রামের বাড়িতে গীতিকে দেখে সে ভাবে— 'গীতি নিজে এসেছে না কেউ পাঠিয়েছে?'' ''ঝুলনকে আনতে পারতে'' এই পুরোনো শব্দবন্ধও আগের মতন আর বলতে পারে না। যে মেয়েকে শৈশবে ছেড়ে যেতে হয়েছিল, শান্তনু ফিরে এসে দেখে সেও যৌবনের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে গেছে। আধুনিক সময়োপযোগী 'কাবুলিওয়ালা' কিন্তু 'কীর্তিমুখ' নয়। পীযূষ ভট্টাচার্য চলে যান অন্য প্রসঙ্গে। আজকের বাঙালির পদে পদে দ্বিচারিতাও তিনি দেখিয়ে দেন এক ফাঁকে। তাই আসে স্যানেটারি ন্যাপকিনের প্রসঙ্গ— ''যে বস্তুটি এতক্ষণ কাঁচের শোকেসের ভেতর সর্বসমক্ষে খদ্দেরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ছিল মুহূর্তের মধ্যে গোপনীয়তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে কারও প্রয়োজনে আসার জন্য।'' (পৃ. ১২/কীর্তিমুখ)

অত্যন্ত অন্তরঙ্গ মূহূর্তে গীতির নতুন প্রাণের আগমনের আশঙ্কা আর ভয় শান্তনুকে হতাশ ও একাকী করে তোলে। নিজিকে তার কীর্তিমুখের মতো মনে হয়। কীর্তিমুখ— ''এ তো জীবনের জীবন সংহার করে বেঁচে থাকারই রূপক।... জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর চেয়ে বড় নিদর্শন বুঝি আর কিছুতেই নেই'' (পৃ. ১১/কীর্তিমুখ)। সন্তান স্নেহ তাকে আবার জীবনের এই ক্রূর উদ্দেশ্যের নজির থেকে সরিয়ে আনে। ঝড়জলের রাতে একা থকা ঝুলনের প্রতি শান্তনু এবং গীতি দুজনের একই রকম দুশ্চিন্তা দুজনকে ঐক্যসূত্রে গেঁথে

নেয়। সব বদলে যাওয়ার মধ্যেও এটুকুই রয়ে গেছে আগের মতো। আর সেই সঙ্গে লক্ষণীয় বিষয়টি হল গল্পটিতে বারবার ঘুরেফিরে আসে চৌবাচ্চা ও মাছের প্রসঙ্গ। শান্তনুর চৌবাচ্চায় বাঁচিয়ে রাখা মাছের তত্ত্বাবধানের কথা ভাবার প্রসঙ্গে গল্পের শুরু হয়েছিল। গীতির আগমনের আকস্মিকতায় শান্তনু একটি মাছকে মেরে ফেলে। অন্যান মাছের দৈনন্দিনতায় একটি মাছের মৃত্যু কোনো বাঁধা তৈরি করেনা। গল্পের শেষে দেখি বৃষ্টির জলে চৌবাচ্চা ভরে গেলে মৃত মাছটিকে টপকে জীবন্ত মাছ সব স্রোতের টানে বেরিয়ে যাচ্ছে। জীবন হল গতি, স্থির হওয়া তো মৃত্যুর নামান্তর। আর জীবন ঠিক নিজের মতো পথ তৈরি করে নেয় ভালো-মন্দ সব অবস্থাতেই। 'কীর্তিমুখ' গল্পটিতে পীযূষ যেমন রাজনৈতিক মতাদর্শের ভাঙাগড়া, বর্তমান সমাজের দ্বিচারিস্বভাবের মধ্যে আদর্শবান ব্যক্তির একাকীত্ব দেখান, তেমনি 'জীবন' সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক চিন্তাভাবনাও তুলে ধরেন।

'কীর্তিমুখ' গল্পের শান্তনুর মতো 'সিরাজদৌল্লার পুত্ররা' গল্পে অন্তু এবং 'আত্মরক্ষা' গল্পে আরো এক অন্তু দুজনেই অনেক বছর পর ফিরে এসেছে নিজের এলাকায়। প্রায় একইভাবে রাজনৈতিক ঘটনাচক্রের শিকার তারা দুজনও। যেন পীযূষ ভট্টাচার্য বিভিন্ন আয়নায় একই ঘটনার প্রতিফলন ধরতে চাইছেন। 'সিরাজদৌল্লার পুত্ররা' গল্পে অন্তু দলের নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশের গোয়েন্দা পাড়াতুতো কাকু এবং প্রেমিকার পিতা নিমাইচাঁদকে হত্যা করে গা-ঢাকা দেয়। অনেকদিন পর ফিরে এসে দেখে মা-বাবার অবর্তমানে বৌদির নির্দেশে দাদা সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা করে দিয়েছে। নিমাইচাঁদের ছেলে স্বদেশ পিতার মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাওয়া পুলিশের চাকুরির সুবাদে এককালের বন্ধুদের দ্বারা এখন 'স্যার' বলে সম্বোধিত হয়। পুলিশের প্রশ্রয়ে পাড়ায় গজিয়ে ওঠা মদের ঠেক, পৃথিবীর আদিমতর ব্যবসার আড়ত। ভক্ষক হয়ে যাওয়া রক্ষকের হাত থেকে বাঁচাতে চাই 'মান্থলি'। যারা আদর্শ বজায় রেখে বাঁচতে চেয়েছিল তাদের অবস্থা আর নীতিহীন মানুষের অবস্থার তুলনামূলক বিচার অন্তুর এক বন্ধু বিমলের কথায় ফুটে ওঠে—

"বাবা শালা সারাজীবন ট্রাফিক সামলে সন্ধ্যায় সিরজদৌল্লার ডায়লগ মুখস্থ করে কাটিয়ে একদিন ড্রপসিন ফেলে দিল— শো বন্ধ এবার বোঝ শালা। নিমাইকাকু মরে কত কমপেনসেশন পাইয়ে দিয়েছিল জানিস? দু-ইঞ্চি ছাতি কম সদা একলাফে এস.আই— একটা এস.আই-এর কামাই কত জানিস? কালো ট্রাঙ্কে ভর্তি টাকা। অ্যাকশন লিডার অন্তু এখন ড্রেনের পাঁকের গন্ধ মাখছে।" (পৃ. ৩২/কীর্তিমুখ)

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লার কোনো পুত্র ছিলনা। যদি থাকত তাহলে হয়তো সিরাজদৌল্লার মতোই ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হত, আর নয়তো রাস্তায় অপঘাতে মৃত্যু হত। গল্পে বিমল অথবা অন্তুর জন্যেই বা কী ভবিষ্যৎ রয়েছে? বিমল, যে চাকরি না-জোটার চরম হতাশ মুহূর্তে ট্র্যাফিক পুলিশ পিতার নিমাইচাঁদের মতো মৃত্যু না হওয়ার জন্য আক্ষেপ করে, সে গরমে হিট স্ট্রোক হয়ে মারা যায়। আর 'অ্যাকশন লিডার' অন্তু

বিমলের মৃতদেহ আগলে অপেক্ষা করে থাকে মৃত প্রেমিকা রিনির আসার। বাকি সব সাধারণভাবে চলতে থাকে। একটা দিন শেষ হয়ে রাতের দিকে গড়িয়ে চলে নিতান্তই সাধারণভাবে। সমাজের গভীরে থাকা ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ চলছেই, বিষিয়ে উঠেছে ক্ষত ধীরে ধীরে, আপাতদৃষ্টিতে কিন্তু সবই স্বাভাবিক। সিরাজউদ্দৌল্লার মতো, অন্তুর মতো দু-একজন চেষ্টা করে ক্ষত নিরাময়ের, কিন্তু চতুর্দিকে মিরজাফর, জগৎশেঠ, নিমাইচাঁদ, স্বদেশ দারোগার মতো লোকেরাই বলবান। তাই রক্তক্ষরণ থামানো যায় না।

'আত্মরক্ষা' গল্পের অন্তু ঘাতক নয়। রাজনৈতিক হত্যার সাক্ষী হিসেবে পুলিশ এবং ক্ষমতাসীন দলের টার্গেট হয়ে পড়ে। তাকে পালিয়ে যেতে হয়। চৌদ্দ পনেরো বছর পর নিজের এলাকায় ফিরে এসে দেখে অনেক কিছুই বদলে গেছে। ভীম, যে চৌদ্দ বছর আগে তার উপর ছুরি চালিয়েছিল, সেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ভীমের থেকে অন্তুর অনেক বেশি আপন মনে হয় সেই অপরিচিত ট্রাক ড্রাইভারকে, যে ঠিক সময়ে ব্রেক কষে থামিয়ে দিয়েছিল ট্রাকটাকে। সেকেণ্ডের হেরফেরে বেঁচে যায় অন্তু। এই ভীমই হত্যা করেছিল রণেন মিত্রের স্ত্রী আর সুবোধ-ইভার মা নববৌদিকে। তারই দল তুলে নিয়ে যায় ইভাকে। কিন্তু খুনী ভীমকে আত্মরক্ষার জন্য পালাতে হয় না শান্তনু অথবা অন্তুর মতো। শাসকদলের প্রশয়ে ভীম স্বমহিমায় থেকে যায়, চলে যেতে হয় অন্তুকে। এ জাতীয় ঘটনাগুলো ভুলে যাওয়াই তাই অন্তুর মতো মানুষের জন্য আত্মরক্ষার সহজ উপায়। অন্তু ভুলতে চায় কিন্তু পারে না। যদিও সে জানে—

"কসাই যখন মাংস কাটে, প্রাণীটিকে হত্যা করা হয়, তখন তার চোখের দিকে তাকানো যায় না, ওটা রিয়ালিটি। ওটাকে অস্বীকার করেই বেঁচে থাকবার জন্য মাংস কিনতে হয়।" (পৃ. ৭০/কীর্তিমুখ)

গল্পকার পীযূষ ভট্টাচার্যের পরিমিতিজ্ঞান এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ইভার সঙ্গে কী হয়েছিল, তার বিশদ উল্লেখ করেননি। এক্ষেত্রে কী হতে পারে পাঠক জানেন, তিনি কেবল ইঙ্গিত মাত্র করেছেন। স্বাভাবিক জীবন আমাদের সমাজে ইভার মতো নারীদের জন্য হয়না, তাই সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো পার্টির দাদারা তাকে চাকুরি জুটিয়ে দেয়। ইভাও ভুলতে পারে না অতীত। জীবন তার কাছে জটিল, প্রশ্নসংকুল এবং নিরাপত্তাহীনতাও বটে। গল্পকার তাঁর নানা গল্পে নানাভাবে দেখান যে জীবন নিষ্ঠুর। রূপকথার মতো আসল জীবনে পাপের পরাজয় আর পুণ্যের জয় ঘটেনা। তবে নিরাশায় সব শেষ নয়। সবকিছুর পরও মানুষ বেঁচে থাকে। জীবন আকর্ষক এবং সুন্দরও বটে। এই সদর্থক ইঙ্গিতেই গল্পটি শেষ হয়—

বাইরে বৃষ্টি নামে। কতদিন যে বৃষ্টিতে ভেজা হয়নি। অন্তুর মনের কথাটি ইভাই বলে ওঠে।" (পৃ. ৭১/কীর্তিমুখ)

'অলৌকিক পাণ্ডুলিপি' গল্পে নিটোল কাহিনি দূরে থাক, কাহিনি প্রায় নিরাকার

বললেও চলে। ষাটের দশকের শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের মন্তব্য এখানে মনে পড়ে যায়। তাঁরা ফতোয়া জারি করেছিলেন যে, যারা গল্পে কাহিনি খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে। পীযূষ ভট্টাচার্য তেমনটা ঘোষণা করেননি, কিন্তু মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এই গল্পের ক্ষেত্রে। উত্তম পুরুষে বর্ণিত গল্পের কথকের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে মিশে যায় ঠোঙার আকারে পাওয়া এক অপরিচিত ব্যক্তির ডায়েরির পাতার বয়ান। বাকি ডায়েরিটুকু কিনে নেয় সে। ফলে দুই অপরিচিত ব্যক্তির জীবন একত্রে এগিয়ে চলে। তবে গল্পটিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে গল্পকারের ছোট ছোট বয়ান। শ্মশানযাত্রীদের একজন গল্পের কথক চরিত্রকে বাদাম খাওয়া শুরু করার জন্য উৎসাহ দিয়ে বলে 'লজ্জা কী শুরু করুন'। কথকের মনে হয়— 'যেন এক অর্থে আমরা সবাই তো সহযাত্রী' (পৃ. ১২/কীর্তিমুখ)। জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলার রাস্তায় আমরা সবাই সহযাত্রী, তারই মধ্যে জীবন। তাই মৃত্যুর সামনে লজ্জা বা ভয় পাওয়া নিতান্তই বাহুল্য। তা সত্ত্বেও মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়, জীবনের শেষ আশ্বাসটুকু আঁকড়ে ধরতে চায়। বিকাশের মৃত্যুর পর তার প্রাক্তন প্রেমিকা, কথকের স্ত্রী সুতপা বিকাশের স্ত্রীর পাশে বসে কথকের দিকে "এমন দৃষ্টিতে তাকালো যেন গতকাল বিকাশের শয্যার পাশে রাখা অক্সিজেন সিলিন্ডারে জলের বুদবুদ এখনও দেখছে" (পৃ. ২১/কীর্তিমুখ)। এই একটি বাক্যে সুতপার মনের বিভিন্ন দিক প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। স্বপ্নার অবস্থান তার হতে পারত, সেই ভয়ও যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি স্বামীর উপস্থিতিতে স্বস্তিও প্রকাশ পেয়েছে।

'পচন পক্রিয়া' এই গল্পগ্রন্থের একটি অবিস্মরণীয় গল্প। ভারতবর্ষে এতবছর পাশাপাশি বাস করেও হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশাল দূরত্ব রয়ে গেছে। তার প্রমাণ নানা সময়ে হওয়া ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা আর বিশেষভাবে মনে করা যেতে পারে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙা এবং তার সঙ্গে হওয়া দাঙ্গার কথা। এমনকি চূড়ান্ত প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিও সময় বিশেষে 'আমরা' এবং 'ওরা'-তে বিভক্ত হয়ে যান। পীযূষ ভট্টাচার্য ১৯৯৯ সালে লিখিত এই গল্পে এই বিষয়গুলিকেই তুলে ধরেছেন। জাহানারা এবং সুকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ভালোবেসে বিয়ে করেছে। অধ্যাপক সুকমল বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও বিয়ের আগে বলেছিল "তোমার জন্য তেমার ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম" (পৃ. ২২/কীর্তিমুখ)। কিন্তু বিয়ের পর জাহানারা যখন পারিপার্শ্বিক চাপে ধর্ম বদলে নিবেদিতা হয়ে যায়, তখন সে নিজেকে উদাসীন নিরপেক্ষতার বর্মে ঢেকে রাখে। অথচ ধর্ম তো জীবনচর্যার অঙ্গ, দীর্ঘদিনের অভ্যাসও বটে। যজ্ঞ করে বা চার্চে গিয়ে বা কলমা পড়ে ধর্ম পাল্টালে কেবল বাইরেটার পরিবর্তন হয়, অন্তরের হয় কি? তবু জাহানারা প্রাণপনে চেষ্টা করে। মেয়ে তিন্নির জন্য লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করে। কিন্তু বাড়ির পাশের পাড়াতুতো দাদাকেও পুরোহিত হিসেবে পায় না। তবু এরই মধ্যে দিন কাটছিল। কিন্তু বাবরি মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া দাঙ্গা এবং দুই সম্প্রদায়ের

মধ্যে তৈরি হওয়া সন্দেহ ও বিদ্বেষ খুলে ফেলে সব মুখোশ। ধর্মনিরপেক্ষতা কিংবা প্রগতিশীলতার সব ছদ্মবেশ খসে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে সেই অনারোগ্য ক্ষত— যার যন্ত্রণা বাঙালি আজও ভুগছে। সাম্প্রদায়িক সন্দেহ-বিদ্বেষ থেকেই তো হয়েছিল দেশভাগ—বাংলাভাগ। আর বাংলাভাগের জন্যই আজও বাঙালি অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। পীযূষ ভট্টাচার্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের তথাকথিত নিরপেক্ষতার মুখোশ খুলেছেন এই গল্পে একজন সার্থক গল্পকারের মুন্সীয়ানায়। নিজের পুকুরের মাছ বিষ দিয়ে মেরে ফেলার জন্য সুকমল বন্দ্যোপাধ্যায় কাউকে সন্দেহ করে কিনা, সরকারি কর্মচারির এই প্রশ্নের উত্তর সে বলে— "আমি এখন নিজেকেই সন্দেহ করি" (পৃ. ২৮/কীর্তিমুখ)। বেশ কিছুদিন পর সেই সরকারি কর্মচারি সুকমল-জাহানারার বাড়ি গিয়ে পুরোনো প্রসঙ্গ তুললে জাহানারা নাকে কাপড় দিয়ে উঠে যায়। অসুস্থ বোধ করে। গল্পের শেষটা প্রশ্ন দিয়ে হয়েছে— "তবে কি আমার উপস্থিতির জন্য সেই গন্ধটা আবার ফিরে এসেছে। না কি আমরা কেউ সন্দেহের উর্ধে নই।" (পৃ. ২৮/কার্তিমুখ)

একথা যথার্থ যে আমরা কেউ সন্দেহের উর্ধে নই। এখানে লক্ষ করার আরো একটি বিষয় হল পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান। সুকমল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধর্ম বদলের কথা ভাবতে হয় না। কিন্তু জাহানারাকেই নিবেদিতা হতে হয়। সব-মিলিয়ে এই গল্পটি সমাজের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে লেখা হলেও তীব্র দাহ সৃষ্টিকারী নয়। পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে যে আগুন থাকে তা কয়েক সেকেণ্ড জ্বালিয়ে সব ছাই করার মতো নয়, এ যেন তুষের আগুন— ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে গোপনে।

"সিজলি মার্ডির পৃথিবীতে চিতাবাঘ" গল্পটিও ধীর প্রতিক্রিয়ায় মানসিক দাহ সৃষ্টিকারী এক গল্প। সিজলি মার্ডি নামে এক অষ্টাদশী রমণী ধর্ষিত হয় এক অর্থবান ব্যক্তির দ্বারা। কিন্তু গল্পটা শুধুমাত্র ধর্ষণের নয়— নয় সিজলির অথবা ইন্দো সুজোকির আরোহী সেই ধর্ষকের অথবা সেই দাঁড়াশ সাপের যে কিনা সিজলিকে পাহারা দেয়। এই গল্প সাঁওতালদের নানা পুরাকাহিনির, এই গল্প ক্ষমতাবানের অত্যাচারের। এই গল্প রাষ্ট্রযন্ত্র সুবিধাবাদীদের হাতে কীভাবে ব্যবহৃত হয়, তারও। তদন্ত কীভবে প্রহসনে পরিণত হয় লেখক তা জানান নিজস্ব কৌশলে—

"তদন্তে গিয়ে সমরকে জানতে হবে, কেন কী ভাবে মানুষ হঠাৎ দেবতা হয়ে যায়। আর দেবতা হয়ে যাবার আগে কেনই বা সিজলি শ্বাস তুলে নিল না, শ্বাস তুলে নিলে এতগুলো প্রশ্নই উঠতো না। চিতাবাঘের সওয়ারিই বা কে? তদন্ত কোন্ সত্যকে কোন্ মিথ্যাকে প্রকাশ করবে! এখানে সত্যও যা মিথ্যাও তাই। সবকিছু মিলেমিশে মণ্ড হয়ে গেছে। এ যেন বাতিল কাগজের মণ্ড থেকে আবার কাগজ তৈরি হওয়া, বাতিল তদন্ত রিপোর্ট ফের নতুন করে লেখা। সে তো বাতিল। আবার লেখা।" (পৃ. ৪০/কীর্তিমুখ)

সমরের মতো যে দু একজন চেষ্টা করে আদর্শকে আঁকড়ে ধরে চাকরি করার,

তাদের অবস্থা পীযূষ ভট্টাচার্য বিস্তৃত করেছেন 'প্রাগৈতিহাসিকের পর' গল্পে। শঙ্কর বিডিও হয়ে আসে পোখরা নামের এক ব্লকে। পোখরার অলিখিত রাজা 'বদ্যিনাথধামের পোখরার এজেন্ট'ভকিল এক রহস্যময় চরিত্র। বাংলাদেশ, বিহারের সীমান্ত সংলগ্ন পোখরাও এক রহস্যময় অঞ্চল। চোরাকারবার, সরকারি নানা রিলিফ ফাণ্ডের টাকার অপব্যবহার, এমনকি মানুষ কিনে দাসে পরিণত করা সবই ভকিল করে। থানা, ব্লক অফিস সবই যেহেতু ভকিলের বাবার প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলে স্থাপিত তাই ভকিলের এ জাতীয় কাজের প্রতিবাদ কেউ করে না, বরং 'একে ম্যানেজ করতে পারলেই সব' (পৃ. ৭২)। শঙ্কর কিন্তু চেষ্টা করে এসবের প্রতিকার করার জন্য। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হয়না। পীযূষ ভট্টাচার্য বিখ্যাত কথাশিল্পী প্রাবন্ধিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতোই লক্ষ্য করেন সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিপত্যবাদ কেমন করে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে ক্ষয় করে চলেছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রবন্ধে লিখেছেন—

"রাজনীতি আজ ছিনতাই করে নিয়েছে কোটিপতির দল। এদের পিছে পিছে ঘোরাই এখন নিম্নবিত্ত মানুষের প্রধান রাজনৈতিক তৎপরতা।.... তাদের মানুষ হয়ে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা, অধিকার আদায়ের স্পৃহা এবং অন্যায় সমাজ ব্যবস্থা উৎখাত করার সংকল্প চিরকালের জন্য বিনাশ করার আয়োজন চলছে।" (পৃ. ৬২/সংস্কৃতির ভাঙাসেতু)

আলোচ্য গল্পেও দেখি তাই চরণ হাড়ি যে ভকিলের কাছে সন্তান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল, সে রাতারাতি উধাও হয়ে যায়। এফ.আই.আর করানোর জন্য তাকে খুঁজে পায় না শঙ্কর। পীযূষ ভট্টাচার্য গল্পকার হিসেবে কাদের উত্তরাধিকার বহন করছেন তাও খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে এই গল্পে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলিয়াসের ঘরানার লেখক তিনি। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পকে স্মরণে রেখেই এই গল্পের নামকরণ এবং গল্পের শেষেও তাই ভিখুর উল্লেখ রয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যে শরীরবৃত্তি তাই ছিল ভিখুর চালিকাশক্তি। আদিম এই প্রবৃত্তির বশে সে খুন পর্যন্ত করে। আর মানুষের ইতিহাস তো ক্ষমতা দখলের লড়াই-এর ইতিহাস। ভকিল সেই ইতিহাসেরই অঙ্গ।

'রমাকান্তর সরলা উপখ্যান' গল্পটি একটু ভিন্ন মাত্রার। পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে রাজনীতির উপস্থিতি এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই গল্পটি তার ব্যতিক্রম। রমাকান্ত নিজেকে এক যজ্ঞডুমুর গাছের সমার্থক ভাবে, তার স্ত্রীর মৃত্যু খানিকটা অস্বভাবিক। বিবাহপূর্ব সন্তানসম্ভাবনায় ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পথে ঝড়ে মন্দিরার মৃত্যু হয়। একই দুর্ঘটনায় রমাকান্ত তার ডান হাত হারায়। সরলা তার স্বামী বিশুর খোঁজে রমাকান্তর কাছে বার বার আসে সত্য জানার প্রচেষ্টায়। বিনিময় প্রথা অনুসারে এবার এনেছে দুটো নারকেল। তার একটা ছুলে শাঁস বের করতে বলে রমাকান্ত। পচাগলা শাঁস বেরুলে সরলাকে আর কিছু বলতে হয় না। তার দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। সে শাঁখা ভেঙে নদীতে স্নান করে আসে। গল্প কিন্তু এখানে শেষ হয় না। রমাকান্ত তার একহাত আর মুখের সাহায্যে নিজে

অন্য নারকেল ছুলে ভাঙে। পুরুষ্ট শাঁস বেরিয়ে আসে। সে ভাঙা নারকেলটি সহাস্যে তুলে দেয় সরলার হাতে। ''হাসিতে যেন বোঝাতে চায়— এই তো জীবন!'' (পৃ. ৪৮/কীর্তিমুখ)। গল্পকার খুব সুস্পষ্টভাবে বলেননি। কিন্তু ইঙ্গিতে মনে হয় রমাকান্ত যে মন্দিরার মৃত্যুর পর বিশ বছর পুনর্বিবাহ করেননি, জীবনের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাওয়া চিরস্থায়ী ক্ষত নিয়ে জীবিত থাকতে থাকতে নিজেরই খেয়াল থাকে না যে সে বেঁচে আছে, সে যেন আবার জীবনমুখীন হয়। সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দেন গল্পকার এভাবে— ''জলে হাত দিতেই তিরতিরিয়ে স্রোত ওঠে। তবে বদ্ধ জলাশয়েও স্রোত ওঠে ভাবতে ভাবতে মাথায় ঢেলে দেয়। এইভাবে অবেলায় স্নানের স্বভাব নয়— তবুও করে।'' (পৃ. ৪৮/কীর্তিমুখ)

এই বদ্ধ জলাশয় যেন রমাকান্তের হৃদয়াবেগ। আর অবেলা তার সাতচল্লিশ বছর বয়স। 'এই তো জীবন'। যখন মনে হয়, কিছুই নেই, বেঁচে থাকার কোনো কারণ নেই, আশা নেই, তখনো মানুষ বেঁচে থাকে। নতুন কোনো স্বপ্ন টিয়ার ঠোঁটে উড়ে যাওয়া যজ্ঞডুমুরের বীজের থেকে হওয়া গাছের মতোই অজান্তে কোথাও তার সবুজ পাতা নিয়ে বেড়ে ওঠে। আর সরলা সেও তো খুঁজছে জীবনের সাধ, বেঁচে থাকার ইচ্ছা। তাই নারকেলের দ্বিতীয় খণ্ড ঘরের মধ্যে আঁতিপাতি করে খুঁজেই চলে সে।

'তদন্ত সাপেক্ষ একটি কাহিনী' আর 'দ্বৈরথ' দুটি গল্পে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে প্রায় একই বিষয়কে তুলে ধরা হয়েচে। রাজনীতি যখন একান্ত ব্যক্তিগত দাম্পত্য জীবনে ছায়া ফেলে তখন তার চেহারা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় কী হতে পারে! 'তদন্ত সাপেক্ষ একটি কাহিনী'তে স্বপ্না এবং সোমনাথের দাম্পত্যজীবন শেষ হয়ে গেছে রাজনীতির করাল থাবায়। আর তদন্ত কতদূর প্রহসন হতে পারে তারও নিদর্শন গল্পটি। স্বপ্নাকে নেহাত ভুল করে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ নকশাল আন্দোলনের উত্তাল সময়। অন্তঃসত্ত্বা এক নারীকে ভুল করে তুলে আনা হয়েছে বুঝতে পেরেও অত্যাচারের মাত্রা খুব একটা কমেনা। লকআপে একরাত কাটিয়ে ছাড়া পাওয়ার পর সন্তানের জন্মলাভের আগেই মারা যায় স্বপ্না। সন্তানটিও ছিল অস্বাভাবিক ও মৃত। তারপর শুরু হয় আরো এক প্রহসন। এরকম কেন হল, তা নিয়ে যেমন মৌখিক চর্চা হয়, তেমনি অস্বাভাবিক শিশুটি হয়ে ওঠে গবেষণার বিষয়। কিন্তু তারও পর রয়েছে। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। এজাতীয় ঘটনার তদন্তের জন্য কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু বিচারে বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। মনে পড়ে যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত কবিতা—

''রাজা আসে যায় রাজা বদলায়
নীল জামা গায় লাল জামা গায়
এই রাজা আসে ওই রাজা যায়
জামা কাপড়ের রঙ বদলায়
দিন বদলায় না।''

সোমনাথ দীর্ঘদিনের এই কমিশনের রিপোর্টের অপেক্ষা করে সেক্রেটারিয়েটে চক্কর কেটে অবশেষে শুনতে পেল— "এটা বহু পুরোনো ব্যাপার, সবাই ভুলে গেছে, এ নিয়ে আর কিছু করবার নেই...।" (পৃ. ৫০/কীর্তিমুখ) সমাজব্যবস্থা-জীবন সবকিছু থেকে বীতশ্রদ্ধ সোমনাথ চলে যেতে চায় দূরে কোথাও। কিন্তু জীবন অপ্রতিরোধ্য। তাই চলে যাওয়ার কথা বলার জন্য সে আবার ফেরার চেষ্টা করে। পুনরায় উল্লেখ করতে হয় যে পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পের এটাও একটা বৈশিষ্ট্য— তিনি সবসময় দেখিয়ে দেন, জীবন নিষ্ঠুর, কিন্তু আকর্ষক— এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি।

'দ্বৈরথ' গল্পটিতে সৈকত ও বিভার দাম্পত্য জীবনে সন্দেহের জাল ছড়ায়, যখন মেয়ে গীতি দেখে বিভা কংগ্রেসে ভোট দিয়েছে। মার্ক্সবাদী সৈকতকে বাহাত্তরে বাড়ি ছাড়া হতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে রাজনৈতিক সন্ত্রাস। কিন্তু সুভাষ বসুর সান্নিধ্য পাওয়া পরিবারের মেয়ে বিভা তার পুরোনো সংস্কার ত্যাগ করতে পারে না। এছাড়া ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকার। এ নিয়ে দাম্পত্য জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হয়। পরদিন নির্বাচনের ফলপ্রকাশে বামফ্রন্টের জয় হলে সৈকত বাড়ি ফিরে আসে, গীতির শরীরের রঙের ছোঁয়ায় বিভাও সুখী হয়। দাম্পত্য কলহের মধুরে সমাপন ঘটে। এই গল্পটি গল্পগ্রন্থের ব্যতিক্রম এই অর্থে যে এটি মিলনান্তক। বৈবাহিক জীবনের একটি সুন্দর দৃশ্যে গল্পটি শেষ হয়েছে। এই গল্পটি ছাড়া গল্প গ্রন্থটির সব গল্পেই একটা দমবন্ধ গুমোট আবহাওয়া থাকে, যা গল্প শেষেও পাঠককে ঘিরে থাকে। এমনকি ইতিবাচক ইঙ্গিতে সমাপ্তি ঘোষিত হলেও গল্পগুলি ঠিক স্বস্তি দেয় না। সেদিক দিয়ে 'দ্বৈরথ' অবশ্যই স্বতন্ত্র।

'খুনী' গল্পটি এক কিশোরের উত্তম পুরুষে বর্ণিত। একটি ঘটনা জ্বালিয়ে দিয়েছে তার সম্পূর্ণ শৈশব, কৈশোর। আর্থিক পরিস্থিতির চাপে মানুষ কী কী করতে পারে তারই শিল্পিত রূপ গল্পটি। প্রসঙ্গক্রমে আসে টিকটিকিকে খনার জিভদানের লোকবিশ্বাস। ছেলেটির বাবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ খেটে বাড়ি ফিরবে। এ আসা সুখের নয়। 'কীর্তিমুখ' গল্পের শান্তনুর থেকেও এই লোকটি হতভাগ্য। কারণ তার জেল হওয়ার কারণ স্ত্রীকে হত্যা এবং এই হত্যার পেছনে যে কারণ ছিল, তা তৈরি করেছিলেন তার নিজের মা। ফলে লোকটির ফিরে আসার আগাম সংবাদ তার মাকে অসুস্থ করে তোলে আর সন্তানকে করে চিন্তিত। এইসব ঘটনা ছেলেটির উপরও প্রভাব ফেলে। তাই সে টিকটিকি হত্যা করে, গুনে গুনে। মারতে মারতে কিছুক্ষণ আগে শোনা অকথ্য-অশ্রাব্য গালিগালাজ করে। কত্তামার শরীরের কাঁপুনি দেখে তার টিকটিকির খসে যাওয়া লেজের নড়া মনে হলে সে হাসি চাপতে পারে না। এভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থা একটি নিষ্পাপ শিশুকে ধীরে ধীরে জটিল মানসিকতার করে তোলে।

গল্পগ্রন্থটির শেষ গল্প 'কোরবানী'। বাচ্চুমিয়া, কুলসুম, কোরবানীর জন্য আনা উট এ সমস্ত চরিত্র ও বিষয় কথাকারের ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নিরক্ষরেখার বাইরে'

উপন্যাসের বৃহৎ পরিসরে হাজির হয়। অসুস্থ কামালের আরোগ্য কামনায় আনা হয় একটি উট। কিন্তু কোরবানীর আগেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় কামালের। বাচ্চুমিয়া সুস্থ হয়ে "বাড়ি ফিরে দেখে স্থলভূমিতে মরুভূমির উট ভীষণ স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করছে" (পৃ. ৮০/কীর্তিমুখ)। কাহিনিসূত্র এতটুকুই কিন্তু গল্পে এসেছে রবীন্দ্রথের 'ডাকঘর', ফকির বিদ্রোহের মজনু শাহ, বাদশাহী আমলের রাস্তায় গ্রামগুলোয় একসময় তুলে নিয়ে যাওয়া নারী, বক্তিয়ার খিলজীর দেবকোট গঙ্গারামপুরের রাস্তা দিয়ে তিব্বত জয় করতে যাওয়া, অপুত্রক রমণীর সন্তানশোক করার আর্তি। আর আবার এসেছে পীযূষ ভট্টাচার্যের জীবন এবং মৃত্যুকে দার্শনিক ভাবনা দিয়ে বোঝার এবং বোঝানোর প্রচেষ্টা— "মৃত্যুর মুহূর্তে পৌঁছে যেন জীবন জীবন হয়ে উঠেছে।" (পৃ. ৭৮/কীর্তিমুখ)

অথবা

"মানুষ তো জন্মের সাথে সাথে অভিশাপ নিয়েই জন্মায়। মানুষ যখন প্রথম মানুষ হয়ে ওঠে তখন কি সে মৃত্যুকেও আবিষ্কার করেছিল?" (পৃ. ৮০/কীর্তিমুখ)

গল্পকার পীযূষ ভট্টাচার্য একজন অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষক। জীবনকে তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখে বোঝার চেষ্টা করেন। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই বেঁচে থাকার যন্ত্রণা তাঁর গল্পে ধরা পড়ে। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে ব্যক্তির জীবন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চাপে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়তে গল্পকার ব্যক্তিগতভাবে দেখেছেন, ফলে গল্পে ফুটে ওঠে তারই আভাস। আর সেই সাথে তাঁর অনন্য বাচনশৈলী গল্পগুলিকে বিশিষ্ট করে তোলে। সব মিলিয়ে গল্পকার পীযূষ ভট্টাচার্য ছোটগল্পের রসিক পাঠকের জন্য অবশ্যপাঠ্য।

আকরগ্রন্থ—

১। কীর্তিমুখ, পীযূষ ভট্টাচার্য / প্রথম প্রকাশ / জানুয়ারি ২০০১ / নয়া উদ্যোগ / কলকাতা।

সহায়কগ্রন্থ ও পত্রিকা—

১। উত্তরভাষা— সম্পাদক কৌশিকরঞ্জন খাঁ / শীত সংখ্যা / ডিসেম্বর ২০১৬ / বালুরঘাট।

২। ছোটগল্পের প্রতিবেদন— তপোধীর ভট্টাচার্য / কলকাতা বইমেলা ২০১১ / বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯।

মনস্তত্ত্ব, উত্তর আধুনিকতা এবং পীযূষ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প

নবনীতা সান্যাল

সময়ের এক ক্রান্তদর্শী সাহিত্যিক পীযূষ ভট্টাচার্য। তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচয় সূত্রটি হল 'নয়া উদ্যোগ' প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন এবং তার মাদি মোষ', (প্রকাশকাল ২০০৯)। সংকলনটিতে তেরোটি গল্প রয়েছে এবং 'নিবেদন' অংশে লেখক জানিয়েছেন যে, তাঁর কোনো কোনো গল্পের উৎস কিছু ভারতীয় লোককথা এবং জনজাতির লোকশ্রুতি। কিন্তু, লোকশ্রুতির কোনো তথ্য উল্লেখ নেই, এবং লেখক জানাচ্ছেন, 'সব মিলিয়ে পাঠক এই রচনাগুলিকে বর্তমান লেখকের গল্প বলে ধরে নিতে পারেন।' এই প্রসঙ্গসূত্র উল্লেখের কারণ এই যে, তা একই সঙ্গে লেখকের স্বাতন্ত্র্য ও আদর্শকে চিহ্নিত করে আপাতকাঠিন্যের বেড়াজালে আধুনিক, আধুনিকোত্তর যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনের মাঝে গল্পকে দাঁড় করান পীযূষ। গল্পসংকলনের প্রথম গল্প 'চার নম্বর স্বপ্ন অথবা

অজানা ফুলের সৌগন্ধ'। আলোচ্য গল্পে 'স্বপ্ন' বিষয়টি তাৎপর্যবাহিত হয়েছে এবং সেখানে আশ্রয় পেয়েছে মনোঃসমীক্ষণ, এমনকি মনোবিকলন বিষয়টিও। লক্ষণীয় শব্দচয়নে সুগন্ধের পরিবর্তে 'সৌগন্ধ' কথাটির ব্যবহারেও স্বতন্ত্র বাকরীতি তৈরি হয়ে উঠেছে।

গল্পটিতে স্বপ্ন প্রসঙ্গ ও বাস্তবের অদ্ভুত দোলাচল রয়েছে। সমান্তরালে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক বিচলন। গল্পের চরিত্র বলতে দু'টি—ক. 'সাইক্রিয়াটিস্ট' এবং খ. মনোজ শর্মা। ফ্ল্যাশব্যাকে নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে আলো ফেলা হচ্ছে মনোজ শর্মার অতীত জীবনে। অবস্থানের অসাম্য, বয়সের দূরত্ব এসব সত্ত্বেও অদ্ভুত সখ্যে তার ডাক্তারের কাছে জীবনের খোলা পাতা মেলে ধরেছে মনোজ শর্মা। এই সূত্রে ডাক্তার আবিষ্কার করেছেন একজন মানুষের অন্তরশায়িত সত্যকে। এ আবিষ্কার সূত্রে তিনি উদ্দীপিত হচ্ছেন এবং খুঁজে পাচ্ছেন প্রকৃতসত্য। এই আবিষ্কার পর্বে যতটাই উন্মোচিত হচ্ছে বর্হিপ্রকৃতি, অর্ন্তপ্রকৃতিও তেমনি। বর্ণনাবৈগুণ্যে অসামান্য হয়ে উঠেছে লেখকের মুন্সিয়ানা— 'জানলার বাইরে আকাশের নক্ষত্ররা আলো গুটিয়ে নেয় এমনই সন্ত্রাস! রাত্রি গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন ছুটে চলে তীব্র গতিতে। অন্ধকারের এ ছোটা যেন রাত্রির বুকের উপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করে ছুটছে— আর রাস্তাগুলো এক জায়গায় মিশে গেলেই সৃষ্টি হচ্ছে এক শূন্যতা।' (পৃঃ ১, 'চার নম্বর স্বপ্ন অথবা অজানা ফুলের সৌগন্ধ'/শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন এবং তার মাদি মোষ'/পীযূষ ভট্টাচার্য/নয়া উদ্যোগ/২০০৯)। ঘটনার ক্রম-উন্মোচন ঘটতে থাকে মনোজ শর্মার স্বপ্নগুলির বিশ্লেষণে। ঘটনাবলি আসলে মনোজ শর্মার প্রতারিত হওয়ার ইতিহাস— 'পেনসন তুলি প্রতিমাসে' (পৃঃ ২) মনোজ শর্মার এই উক্তির অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডাক্তার জানতে পারেন অজানা তথ্য। আর, তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মনোজ জানায়— 'আমি একবার এম. পি. হয়েছিলাম, আমার এম. পি. বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর লোকসভা ভেঙে দিয়ে নতুন ইলেকশন হয়। বাবা বেঁচে থাকলে বাবাই ক্যান্ডিডেট হত; তার বদলে আমাকে দাঁড় করায় বাবার পার্টি। বাবার জিতবার মার্জিন সেবার কম ছিল বলে রিস্ক নেয়নি— সহানুভূতির ভোট পাবার কৌশল আর কী?! (পৃঃ ৫, ঐ) ঘটনাপ্রবাহে চরিত্রটির দায় ছিল না কোনো— অথচ পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণেও ছিল না। চরিত্রটির স্বপ্নদর্শনতত্ত্বটিও ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণতত্ত্বকেই আশ্রয় করে। এভাবেই মনোজ শর্মার অন্তরে নিহিত মানুষটিও প্রকট হতে থাকে— 'আপনি কী করেন'? (ঐ) এর উত্তরে পেনশনের ইতিহাস ব্যক্ত হয়। এর আগেই অবশ্য চরিত্রটি স্বপ্ন প্রসঙ্গ এনেছিল। বলেছিল একটি নদীর কথা, নৌকার কথা, সেই স্বপ্ন প্রসঙ্গ শেষ হয়েছিল এভাবে— 'আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম আমার লাশটা ভাসতে ভাসতে দ্বীপের তীরে এসে পৌঁছালো, স্রোতের টানে এ ভেসে আসা কিম্বা জানি না— যেমন জানি না, উজানে সাঁতরে লাশ পৌঁছেছিল কিনা। (পৃঃ ৪)

—বলা বাহুল্য জীবনের প্রবহমানতার সূত্রে এসেছে নদী প্রসঙ্গ। আর নৌকা

প্রতীকী হয়ে এসেছে সমস্যা উত্তরণের মাধ্যম হিসেবে। এছাড়াও চরিত্রটির জীবন্মৃত অবস্থায় থেকে যাওয়ার উৎসটিও এই সূত্রে আবিষ্কৃত হয়। এরপরেই আসে ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন। বিকলাঙ্গ সন্তান, উচ্চাভিলাষী স্ত্রী এই সংকটের মধ্যে তাকে এনে দাঁড় করায়। সঙ্কট উত্তরণ সূত্রেই আসে আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্মপীড়ন। স্যাডিস্ট মনোজ লোকসভার হৈ-হট্টগোলের মধ্যেও তাই ঘমিয়ে পড়ে; স্বপ্নজগতে নিবিষ্ট হয়— স্বপ্নে সে দেখে বিকলাঙ্গ শিশুকন্যাটি যেন পুর্ণযুবতী হয়ে উঠেছে। স্বপ্ন ও বাস্তবের দোলাচলের মধ্যে বিভ্রান্তিও আসে। স্বপ্নে দেখা 'মন্ত্রপূত জলপাত্র দুটি'কে হঠাৎ চাক্ষুষ করে যেন মনোজ শর্মা। মনোবিকলনের এই স্তরে পৌঁছে হঠাৎ সে বলে ওঠে, 'এই হচ্ছে মন্ত্রপূত জলপাত্র। একটা পাত্রের জল ছিটিয়ে দিলে খুকি ভরভরন্ত যুবতী হয়ে উঠত— আরেকটা পাত্রের জল ছিটালেই আবার পূর্বাবস্থা।' (পৃঃ ৬, ঐ) প্রশ্নাতীতভাবেই লোকটিকে উন্মাদ মনে হতে পারত কিন্তু তা হচ্ছে না; তার কারণ মনোজ শর্মার বাস্তব উপলব্ধিও যথেষ্ট স্পষ্ট। সমস্যার গভীরে গিয়ে আবিষ্কৃত হয় তার জীবনের ভয়ংকর সত্য। এই সত্যের মুখ— প্রথমত, বিকলাঙ্গ শিশুটিকে তার স্ত্রী চেয়েছিল পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে, এবং মনোজ শর্মা রাজি হয় নি। দ্বিতীয়ত, বাড়িতে আনাগোনা এক সন্দেহজনক পুরুষকে নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হয়, এবং মনোজ শর্মা জানায় 'পাক্কা সাত বছরের চেষ্টায় ছেলেটাকে হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েছিলাম!, (পৃঃ ৮, ঐ)। মন্ত্রপূত জল-সংক্রান্ত বৈকল্যটি এতক্ষণে বাস্তবের মাটি স্পর্শ করে, এক অসহায় মানুষের বৈকল্য অনুসন্ধান করে স্তব্ধ হন ডাক্তার। উন্মোচিত হয় আরেক সত্যও— স্ত্রী হত্যার দায় মনোজেরই। বুঝতে পেরে শিহরিত হন ডাক্তার, হিম হয়ে যায় তার শরীর— 'পরদিন সকালেই দেখি একটি নাম-না জানা ফুলের গাছ জন্ম নিয়েছে সেখানে— জন্মেই গাছটিতে ফুলে ফুলে ছয়লাপ। ফুল ফুটেই চলেছে সেখানে, এখন বাড়িময় মিষ্টি-ফুলের গন্ধ। খুকিকে সেখানে নিয়ে এলেই ঘুমিয়ে পড়ে, না হলে সারারাত তার সঙ্গেই জাগে', (পৃঃ ১০- ঐ) — এই স্বীকারোক্তিতেই গল্পের শেষ। সত্য উন্মোচন ও নামকরণ তাৎপর্যটি এখানেই সার্থক হয়, এবং আশ্চর্যের যেন কোথাও চরিত্রটির আত্ম-উন্মোচন একটা রিলিফ দেয় পাঠককে; সার্থক হয় গল্পটির নির্মাণ।

'শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন এবং তার মাদি মোষ'— অন্যতম আরেকটি শক্তিশালী গল্প। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কিশোরীমোহন। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে, দার্ঢ্যে উজ্জ্বল সে। অন্ধ দেশভক্ত কিশোরীমোহন ইংরেজকে শাস্তি দিয়ে চায়, এবং সোজা পথে সেটা হবে না জেনে সে চাতুর্যের আশ্রয় নেয়। এরই মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে অন্য এক গল্প। সে গল্পের মূলে রয়েছে মিথ্যা মিথ-কেন্দ্রিকতা। তবু, এই রটনা থেকেরই গল্পের শুরু। কবিতার মতো কিছু বাক্যবন্ধ লেখাটিকে উত্তুঙ্গ মাত্রায় নিয়ে যায়। গল্প শুরুতে আছে— 'দৃশ্যমান নয়, যেন অশরীরী, যে কোনো রকম ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে সব সময়ই শ্বাস নেবার শব্দ উঠে আসে— এই রকম মহিষাকৃতি ঝোপগুলোর সামনে কোনদিনই দাঁড়াবার সাহস হয় নি কিশোরীমোহনের

বংশধর বলে।' (পৃঃ ৩০, ঐ), বাক্‌নির্মাণ কৌশলে গল্পটির নিজস্ব অবয়ব পেতে থাকে। লেখক আলোচ্য গল্পের বিষয়ের সত্যতা অনস্বীকার্য বলে জানিয়েছেন— 'কোনো-না-কোনো দিন যদি সত্যিই এই কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে যায় অর্থাৎ ছোটা বন্ধ হয়ে যায় বা একদিন-না-একদিন সবকিছুকে থামতেই হয় এ কথা ভাবলেই তারা এমন উত্তেজিত হয়ে পড়ত যে একটা এসপার ওসপার করার মনোভাবে মন্ত্রের উৎপত্তির খোঁজে বেড়িয়ে পড়ত।' (পৃঃ ৩১, ঐ)।প্রসঙ্গত, এ গল্পের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে, আছে রাজনৈতিক আলোড়নের কথাও।স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ধিকিধিকি ক্ষোভের আগুনে আহুতি পড়লেই সেই আগুন যে কেমন সর্বগ্রাসী রূপ নিতে পারে, আলোচ্য গল্পে তা প্রমাণ ধরা রয়েছে।ঘটনাক্রমে জানা যাচ্ছে যে, বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে নিয়ে তার উপর অত্যাচার নিয়ে একটি গল্প কথা প্রচলন ছিল,— 'তখন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের বিষে বিষে ছয়লাপ শরীরটা নিয়ে একটা কাহিনি উজানের দিকে ছুটে ক্ষণকাল জিরিয়ে নেবার জন্য থেমেছিল আর তখনই সে সেই কাহিনির ভিতর এক শূন্যদেশ তৈরি করে নেয় নিজে নিজেই' (পৃঃ ৩১)। সেই কল্পকথাকে খণ্ডন করে গল্পের শেষে লেখক বলেছেন— 'প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ওভাবে মারা যায় নি, ধরা পড়বার আগেই বিষ খেয়েছিলেন।' কিন্তু, এই সত্য প্রকাশের বহু আগেই জল অনেক দূর গড়িয়ে গিয়েছে। অন্ধ দেশপ্রেমিক কিশোরীমোহন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য গুনিনের পরামর্শে মন্ত্রপূত কলা খাইয়ে 'এমিলি মেমসাহেব'কে বশ করে একই রকম অত্যাচার করতে চায় মেমসাহেবকে।বিপ্লবী সংগঠনের সদস্য ব্রজগোপাল তাকে সমর্থন করে না কিন্তু আশ্চর্যের যে, তাকে অন্ধভাবে সমর্থন করে তার স্ত্রী সবিতারানি।কিন্তু ঘটনাচক্রে এমিলি মেমসাহেবের কাছে পৌঁছায় না সেই মর্তমান কলা। বাবুর্চিকে হাত করে মেমসাহেবের টেবিলে তা পৌঁছানোর আগেই তা চ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।এরপর কাজের লোক সেটা আনাজপাতির খোসার সঙ্গে ফেলে দিলে তা গবাদি পশুদের মধ্যে একটি মাদি মোষের খাদ্য হয়। সেদিন যারা দুপুর ধরে সবিতারানি ব্যস্ত থাকে সেই ঘর সাজানোর কাজে, সেখানে 'মন্ত্রের ক্রিয়াতে মেমসাহেব ছুটে আসবে' (পৃঃ ৩৪), কিন্তু ছুটে আসে মাদি মোষ এবং তার কামার্ত চলার মধ্য দিয়ে উঠে আসে 'শাপমুক্ত হতে না পারা মাটির ধুলো'— (পৃঃ ৩৫)। সর্বোপরি ব্যাখ্যাতীত ছিল ঐ মন্ত্রের ক্রিয়া। বর্ণনাময়তার শেষে দেখা যায় না কিশোরীমোহনকে বা মাদি মোষটিকে।বরং দেখা যায় কিশোরী স্ত্রী সবিতারানিকে।অবিশ্বাস্য হলেও অন্ধবিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষারত সবিতারানি বসে থাকে, ভাবে, 'কেননা মন্ত্রে কত কী হয় আর মোষটা মেমসাহেব হতে কতক্ষণ!' এই বিশ্বাসসূত্রটি অবশ্য পরক্ষণেই পাল্টে যায় কারণ পরবর্তী বংশধররা এ নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না।এ গল্পে সমান্তরালে চলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব।কিশোরীমোহনের বংশধর সোমনাথের গল্পও এখানে অদ্ভুত দক্ষতায় জুড়ে দিয়েছেন লেখক— 'ফুলশয্যার প্রথম রাত্তিরেই সে মাদি মোষের গর্জন শুনতে পেয়েছিল.... ভয়ে

ভয়ে বউয়ের দিকে তাকাতেই মনে হল গর্জনটা ওখান থেকে উঠে আসছে আর এক দৌড়ে সে দরজা খুলে ছুটে গিয়েছিল, একেবারে হরিদ্বারে গিয়ে থেমেছিল তা।' (পৃঃ ৩৬)। এই যে, শব্দচয়ন যেখানে যৌনতা কোথাও অবদমিত হয়ে আছে, তা প্রকট হচ্ছে 'গর্জনে'। সেখানে তার ঠিক পরেই একটি দৃশ্যে সোমনাথের বউ নয়নতারাকে দেখা যাচ্ছে ইচ্ছামতীর সামনে যেখানে সোমনাথের মৃতদেহ ভেসে উঠছে, অথচ অদ্ভুত আমোঘ এক নিয়মে, 'মাছেরাই ওর শরীরকে মুক্তি দিয়ে দেবে—'। জীবনের ভিন্নপাঠ তবু কখনো উঁকি দিয়ে যায় নিয়মের বাইরে, পাঠক্রমের বাইরে। তাই, মৃত সবিতারানিকে দেখা যায় ইংরেজ মহিলাদের মত সাজপোশাক পড়ে, নিরাভরন দুটি হাত— নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছেন। আর তার পরেই জীবনের উত্তাপ সঞ্চারিত হয় দুটি প্রাণে। নামহীন কথক চরিত্র ও সোমনাথের স্ত্রী নয়নতারার মধ্যে স্পন্দিত হতে থাকে জীবনের উদ্দিপনা— 'নয়নতারার ঠোঁট টিপে হেসে উঠবার মধ্যে সেদিন ছিল না মন্ত্রদুটির হারিয়ে যাবার আপশোস, মাদি মোষের প্রসঙ্গ।' (পৃঃ ৩৯) এভাবেই চিরন্তন সত্য হয়ে ওঠে বিশ্বাস ও প্রেম, যুক্তিবাদের দ্বারা বাস্তব পৃথিবীর জন্য যা অর্জিত প্রতিষ্ঠিত হয় আর অভিনবত্বে সার্থক হয়ে ওঠে সৃষ্টি।

'কাপাসতুলোর মুক্তো বীজ' গল্পটিও এমনই এক অনবদ্য সৃষ্টি। গল্পটির শেষে লেখক জানাচ্ছেন গল্পটি একটি তেলেগু রূপকথা। কিন্তু, প্রাসঙ্গিকভাবেই একটা প্রশ্ন ওঠে যে, গল্পটি কি অনুপ্রাণিত? সে কথা জানা যাচ্ছে না। তবে গল্পনামটি অদ্ভুত আবহে রহস্যময়তায় ইংগিত দেয়। গল্পটি নির্মণে সেই রহস্যময়তাকে প্রশয় দিয়েছেন লেখক। গল্পের বুনোটটি ঠাসা নয়, কাব্যময়তা নির্মাণ অংশে ছড়িয়ে রয়েছে। কখনো গল্পে প্রধান চরিত্র কালবৈশাখী, কখনো বা মাঠ, কখনো নাম-না বলা মানবিক চরিত্রই প্রধান। পুরাণ, মিথ, কল্পনা এবং সেসবের ভাঙন— পুর্ণনির্মাণ গল্পটিকে দিয়েছে এক অনায়াস চলন। বর্ণনায় কাব্যময়তা এগিয়ে নিয়ে গেছে গল্পটিকে— 'প্রত্যেকটা দিনই যেন বজ্রপাতের আগের শেষ দিন। এ প্রান্তরে দাঁড়ালে আকাশের দশদিক চিনতেই হবে, বুঝতে হবে যে মোষটা উঠে আসছে তাতে বজ্রপাতের কতখানি সম্ভাবনা।' (পৃঃ ২১, ঐ)। গল্প শুরুতেই এরকম অমোঘ বাক্যগুলি লেখকের নিজস্ব ঘরানা। এবং নির্মাণ যুক্ত হয়ে থাকে কল্পদ্রষ্টা লেখকের নিজস্ব দর্শনের সঙ্গে। নির্মাণে নিজস্বতা, মিথ ভাঙনে ও নির্মাণেও সম্পৃক্ত হয়ে থাকে লেখকের মনন— 'কাপাসতুলোর বীজগুলি কোনো এক কালে ছিল মুক্তোর। চাঁদবুড়ি সরাসরি কোনো কোনো পূর্ণিমায় তুলো নিয়ে যেত অন্ধকার রাতে চরকা কাটবে বলে— চাঁদের লুপ্ত হবার সময়কালের অন্ধকারে কাপাসতুলোর মুক্তোর বীজের আলোতে।' (পৃঃ ২২)। পুরাণের অপূর্ব নির্মাণ দক্ষতায় গল্পটি পাঠককে আকৃষ্ট করে। অসাধারণ বর্ণনায় শব্দ নির্মাণও হয়ে ওঠে তারিফযোগ্য— 'হার্মাদ গাছগুলোর মূলসহ উপড়ে নিয়ে যাবার জন্য মত্ত, তখন কালবৈশাখী নিজের রাগ নিজের বশে রাখতে না পেরে বজ্র হয়ে নেমে এসে সবকিছুই ধ্বংস করে দেয়।' (ঐ)।

গল্পহীন গল্প নয়, অথচ গল্প বলা খুবই নির্দ্দিষ্ট নয়। সেই অনির্দেশ্যকে লক্ষ্য

করেই গল্পটির চলন, গল্পটি আসলে একটি মানুষের কথা বলে— যে মানুষ জন্ম থেকেই পরিত্যক্ত এবং পালিতা জননীর আশ্রয়ে লালিত। চরিত্রটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'সে' সর্বনাম চিহ্নিত। একেবারে শেষে তাকে 'মাগন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। বিস্তীর্ণ মাঠ থেকেই এ গল্পের শুরু এবং সেখানেই তার শেষ। প্রসঙ্গত, মাগন চরিত্রটিকেও পাওয়া গিয়েছিল মাঠেই এবং তার মৃত্যুও মাঠে। মাগনের জন্ম ইতিহাস নেই তার জীবন কাপাসতুলোর বীজের মতই উড্ডীন-ছন্নছাড়া। এইখানেই গল্পনামটি তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে— 'সেখানে মাগনের বউ শুয়ে শুয়ে ভাবে মানুষটাও কি তারই মতন স্বপ্ন দেখেছিল সেই রাতে?' (পৃঃ ২৮, ঐ)। মাগনের চরিত্র প্রসঙ্গে বারবার আসে পাখিদের কথাও। পাখিদের উড়ে চলার সঙ্গে, তাদের আনন্দময় সংগীতের মধ্যে রূপকায়িত হচ্ছে চরিত্রটির বোহেমিয়ান জীবনধারা— 'পাখিরা একসঙ্গে উড়ে গিয়েছিল আকাশ বাতাসের আলোড়নে— ফিরে এসে কোথাও না বসে আকাশেই মেঘের আকৃতি সৃষ্টি করে— সেই মেঘে যেন ছিল প্রচুর বৃষ্টির সম্ভাবনা।(পৃঃ ২৮, ঐ), এই যে অন্যধারার মানবজীবন, তার জীবনচর্যা তাকে যেন কোথাও আবার দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন লেখক। অক্লান্ত এক অন্বেষণে গল্পটি যেন অর্ন্তসত্ত্বার দিকে নিরন্তর এক যাত্রার রূপায়ন।

পীযূষ ভট্টাচার্যের প্রতিটি গল্পেই যেহেতু নিজস্বতা চূড়ান্ত হয়ে ওঠে। গল্প বিষয় নির্বাচন, গল্প বলার ধরণ, আঙ্গিক সবক্ষেত্রেই গল্পধারা স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। আর, এত বিচিত্রধারার গল্পের প্রায় প্রতিটি আলোচনাযোগ্য, বিশ্লেষণযোগ্য। কিন্তু, সংক্ষিপ্ত পরিসরে সব গল্প আলোচনার সুযোগ থাকে না বলে, নির্বাচন করতেই হয় অতি পছন্দের গল্পগুলি। গল্পকারের অধিকাংশ গল্পে আধুনিকোত্তর মানসিক দ্বন্দ্ব, মনস্তত্ত্বকময় জটিলতা গভীর ছাপ ফেলেছে। এরকমই একটি গল্প 'ইশকাবনের সাহেব'। নামটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রচলিত 'ইশকাবনের বিবি'র উল্টো পুরাণে এ নামটি আলোচনা প্রসঙ্গ নিয়তিবাদ প্রসঙ্গ প্রায় একরকম নস্যাৎ করেই মানিক জানিয়েছিলেন যে, মানুষ ক্রীড়ানক হয় নিজ প্রকৃতির কারণে, নিজের চরিত্রের দুর্বলতাই মানুষের নিয়তি নির্ধারণ করে। আলোচ্য গল্পটির কেন্দ্রে যে কথক চরিত্র— তার যাপন ইত্যাদি মনে করিয়ে দেয় মানিক কথিত ক্রীড়ানক হওয়ার প্রসঙ্গ। প্রতারণার যে খেলায় চরিত্রটি অভ্যস্ত ছিল, সেই খেলায় আজ যেন নিজেই সে ট্রাম্পকার্ড— 'ইশকাবনের সাহেব'। গল্পটির সূচনায় অসামান্য বাকরীতি শাশ্বতকালের সম্পদ হয়ে ওঠে— 'আছেন, দুই দিন তিন দিন একরাত্রে জাগিয়া দেখেন, শয্যায় কাঞ্চন নাই, কিন্তু কপট নিদ্রা ধরিয়া শুইয়া রহিলেন' (পৃঃ ৪৮ ঐ)। সাধু ভাষায় রচিত এই বাক্যবন্ধ আসলে মূল গল্পের ধরতাই। এ গল্পেও কথক চরিত্র নামহীন, জানা যাচ্ছে তার স্ত্রী নাম কাঞ্চন, এও জানা যাচ্ছে যে স্ত্রী তাকে ত্যাগ করেছে। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, স্মৃতির আনাগোনায় গল্পটির নিজস্ব চলন নিয়ন্ত্রিত হয়। — 'কাঞ্চনের চলে যাওয়া ও ফিরে আসার সময়কালের মধ্যে প্রতিদিন পেশেন্স খেলতে বসি।' (ঐ), এই খেলা আসলে নিজের সঙ্গেই এবং অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে নিজেকেই খুঁজে ফেরা। স্ত্রী কাঞ্চন চরিত্রটিকে ত্যাগ করে

গেছে নৈতিক বিরোধিতায়। বিয়ের পর বছর তিনের দাম্পত্য এবং সাত বছরের বিচ্ছেদ এর মধ্যেই চরিত্রটির জীবন কোথায় যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। কেন এই বিচ্ছেদ তাদের? এর উত্তর পাওয়া যায় বিচ্ছেদকালীন কথপকথনে। আদালতে দাঁড়িয়ে হাকিম তাদের বলছে— 'ভালবাসা মরে না, বলুন অবিশ্বাস ঢুকে গেছে', (পৃঃ ৪৯ ঐ)। লেখকের নিজস্ব ভাষ্য এরপরেই সংযুক্ত হয়েছে— 'বিচ্ছেদের জন্য কোনো রূপকথা তৈরি হয়নি', (ঐ)। এরপরেই নানা দৃশ্যের অবতারণা এবং কাঞ্চন চরিত্রটিকে দেখা যাচ্ছে সদর্থক ভূমিকায়। ফ্ল্যাশব্যাকে এসেছে কাঞ্চনের সমাজসেবার নানা দিক, এবং এই সূত্রেই যে পৌঁছে যাচ্ছে পতিতালয়ে। অসুস্থ, বিপন্ন পতিতাদের শুশ্রুষার জন্য লড়াই চালাচ্ছে কাঞ্চন। আর তার বিপরীতে প্রশাসনের ভূমিকায় বিকৃত, বিক্রিত তার প্রাক্তন স্বামী। এ প্রতিসম অবস্থানে দাঁড়িয়ে কথক চরিত্রের মনে হয় হাকিম তাদের জানিয়েছিলেন 'আপনাদের একটি সন্তান থাকলে বিষয়টা বোধহয় অন্যরকম হত' (পৃঃ ৫১)। এর মধ্যেই মিথ্যাচারের ফল হিসাবেই যেন স্কুলের বিল্ডিং ভেঙে যায়, মৃত্যু হয় বাচ্চাদের। প্রশাসকের ভূমিকায় ঠুঁটো হয়ে থাকে কথক চরিত্র। অদ্ভুত রসায়নেই কোথাও সময় মিলিয়ে দেয় অনেক জীবনকে 'একুশজন সন্তান হারানো মা-দের নিয়ে' (পৃঃ ৫৫)। কাঞ্চনের লড়াই শুরু হয়, আর তা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেন কথক। এভাবেই উভয়ের বিপরীত দর্শন মিলে যায় পতিতালয়ে এসে। অসংযমী, অসংবৃত কথক ও আদর্শময়ী, লড়াকু কাঞ্চনের বিরোধের ভাষণটি স্পষ্ট হয়। গল্পের শেষে জীবনের ট্র্যাজেডি ফুটে ওঠে, — 'অরণ্যের বৃক্ষের উপর মাণিক হংস ডেকে ওঠে— হা! হা! হা! (পৃঃ ৫৭)।

এরকম আরও কয়েকটি গল্পের উল্লেখ না করলেই চলে না, যেমন— 'রিসার্চের বিষয় পাল্টে যাচ্ছে', 'সুরম্য টয়লেট', 'যে গল্প পাগলি জানে', প্রভৃতি। প্রতিটি গল্পও নিজস্বতায় অনবদ্য। জীবনের নানা স্তর থেকে উঠে আসে গল্প। জীবন অভিমুখী গভীর তত্ত্ব সন্ধানে গল্প হয়ে ওঠে অনিবার্য-অর্ন্তনিহিত জীবনের সত্য-রূপায়ন। অনায়াস নির্মাণে পীযূষ ভট্টাচার্য পৌঁছে যান জীবনের গভীরে; ডুবুরির মত অন্বেষণ করে নিয়ে আসেন গহন অতল থেকে গভীরতম সত্য। জীবনবোধে উজ্জ্বল, তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে অর্ন্তসাধনার নিবিড় ফসল। সাহিত্যিকের সাহিত্য জীবনের সার্থক ও বোধহয় সেখানেই, আর সে মূল্যায়নেই পীযূষ ভট্টাচার্যের ছোটগল্পগুলি সফল ও সার্থক বলে মনে হয়।

পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প : সময়ের 'দহ'

রঞ্জন রায়

"যারা কুকুর পোষেন, তাদের কাছে শুনেছি, বাড়ির সকলের শরীরে কুকুরের গায়ের গন্ধ গোপনে ছড়িয়ে থাকে। সে গন্ধ কোনও মানুষ পান না কিন্তু আর একটা কুকুর ঠিক পায়। সেই গন্ধ পেয়ে গেলে কুকুর আর তাকে আক্রমণ করে না। বছরের পর বছর শুধুই পড়ে গেলে হয়তো কুকুরের মতো অলৌকিক ঘ্রান ক্ষমতা তৈরী হয়।... পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে সেভাবেই গন্ধ পেয়েছিলাম।"

বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক দেবেশ রায় এভাবেই বাংলা গল্প ভুবনের প্রায় অনালোচিত কথাকার পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পকার সত্তার মূল্যায়ণ

করেছেন। সময়ের হাত ধ'রে বাংলা ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথ থেকে আজ অনেকটা পথ চলে এসেছে। তার চলার ছন্দে লেগেছে নিজস্ব সুর। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ মানুষের জীবন ধারাকে ক্রমশই বদলে দিয়েছে। সেই বদলের বাঁকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে আমরা কালিক মানুষ আজ পিছনে ফিরে নিজেরা নিজেদেরই ভেতরে অবলোকন করে যখন দেখি, তখন আমাদের অন্তর্গত সত্তাটিকে আমরা নিজেরাই চিনতে পারি না। আমাদের শিকড় বহুদূর বিস্তৃত হয়ে গিয়ে আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনের সেই বটগাছটার মত হয়ে গেছি। এক বিচ্ছিন্ন অথচ পরস্পরের সঙ্গে একটা অস্পষ্ট সম্পর্কের বুননে আটকে আছে আমাদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। সেই অদ্ভুত সময়ের গল্পকার পীযূষ।

গঙ্গার বয়ে যাওয়া সীমারেখাকে ধরে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের পোষাকী নাম উত্তরবঙ্গ। সেই উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ অংশে আত্রেয়ী নদীর মফস্বল শহর বালুরঘাটে গল্পকার পীযূষ ভট্টাচার্যের বেড়ে ওঠা, যৌবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, আর বার্ধক্যের বারাণসী সৃজিত। আত্রেয়ী নদী গল্পকারের অন্তর্গত রক্তের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সময়ের ধারা যেন এই নদীর হ্রদে এসে বাঁধা পড়েছে। সেই বাঁধা হ্রদের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর 'দহ' গল্পটি। এখানে একটি প্রচলিত বিশ্বাসের পথ ধ'রে লেখক পৌঁছে গেছেন সুদূর অতীতে। আবার গল্পের অন্তিমে এসেছে অনাগত রুক্ষ-ভবিষ্যতের অনিবার্য ব্যঞ্জনা।

ধ্বনি পরিবর্তনের ধারায় 'হ্রদ' শব্দটির উচ্চারণ বিপর্যয় ঘটেই সৃষ্টি হয়েছে 'দহ' কথাটি। সময়ের সেই দহে আটকে পড়েছে জীবন। সেই জীবনে অভ্যস্ত মানুষকে খুঁজতে গিয়ে পীযূষ তাঁর একটি আলোচনায় লিখেছেন—

> "মানুষের দিকে তাকাতেই মনে হয়—মানুষের ভেতর কী আছে? এ আমার আজন্ম কৌতুহল।... সব সময় মনে হয় চেষ্টা করলে অনেক কিছুই পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষকে পাওয়া যায় আংশিক। এ ভীষণ কঠিন কাজ তথাপি গল্প লিখি, কেন না নিজেই দাঁড়তে চাই আজকের জীবন আর কালকের জীবনের মাঝখানে। তখন দূরের অস্পষ্ট মহাজগৎ ক্রমশ ধরা দেয় অস্পষ্টতা কাটিয়ে—তখন কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো মানুষের গল্প থাকে না—হয়ে ওঠে নিজের আত্মচৈতন্যের পুনরুদ্ধার।"

—এরকমই এক আত্মচৈতন্যের গল্প হল 'দহ'। আমাদের ভাবনার অচলায়তনে যে অজস্র অন্ধবিশ্বাস-সংস্কার রয়েছে এই গল্পে তারই একটি তুলে এনেছেন লেখক। 'মব সাইকোসিস' বা জনরব কীভাবে আমাদের জীবনে এক অপ্রিয় সত্য হয়ে ওঠে—সেই অস্বস্তিকর অবস্থায় এক জীবন্ত চিত্র হয়ে উঠেছে গল্পটি।

গল্পের সূচনাতেই একটা বিজ্ঞাপন দেখে মনে পড়ে কবি শঙ্খ ঘোষের সেই বিখ্যাত কবিতাটি—'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'। প্রতিদিনের জীবনে এই বিজ্ঞাপন কীভাবে

আমাদের এক প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়—তার পরিচয় লেখক দিয়েছেন। গল্পে বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিনিধি শিবনাথ এসেছে মৃতবৎসা স্ত্রীর সন্তান বাঁচিয়ে রাখার আশায় জনৈক তান্ত্রিক বাবার কাছে মন্ত্রপুত লকেট গড়িয়ে নেবার আকাঙ্খায়। গল্পকার লেখেন—

> ''মন্ত্রপুত ছিন্নমস্তা কালীর লকেট (রূপা) সডাক ১৭৫ টাকা। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে শিবনাথ হাওড়ার তস্য গলি ঘেঁটে তান্ত্রিক বাবাকে খুঁজে পায় এবং মণিমালার জন্য সোনার লকেটই বানিয়ে ফেরে।''

—এই লকেট গড়তে গিয়ে শিবনাথ দামের কথা ভাবে নি। কেননা 'এসব ক্ষেত্রে হিসাব করতে নেই।' রূপার বদলে সোনার লকেটই গড়িয়েছে শিবনাথ—যাতে ফলটা পাওয়া যায়। এরপর সেই লকেটটাই ছিনতাই করতে এসে অসহায় ছিনতাইকারী যুবক জনরোষের শিকার হয়। এই জনরোষ হল জনরবের অনিবার্য ফসল। অপরাধের গুরুত্ব বিচার করার প্রবণতা বা মানসিকতা জনমানসে স্থান পায় না। একটা আর্ত চিৎকারে শিবনাথের স্ত্রী যখন বলে 'হারটা নিয়ে গেল' আর শিবনাথের 'চোর চোর' বলে চিৎকারে জনগণ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বিপরীতে ছিনতাইকারীর সামনে কোনো পথ খোলা থাকে না। কেননা সে 'হয়ত জানত না, বাঁক ঘুরলেই বাঁধ রোড, তারপর নদী। নদী এখানে ভীষণ গভীর, দু বাঁশ জলের দহ।' আর এর ফলে তার মাথায় নেমে আসে জনরবের নিয়তি নির্দেশিত খাড়া। মুখ থুবড়ে পড়ে অসহায়ভাবে মৃত্যু হয় তার। কিন্তু মৃতদেহের সঙ্গে হারটি পাওয়া যায় না। শিবনাথ রাতের অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে পথে পথে সেই হার খুঁজে পায়নি। সন্দেহ করেছে ছিনতাইকারী নিশ্চয়ই হারটি গলধঃকরণ করেছে। কিন্তু সেই আশংকাও নিশ্চিত হয়ে যায় মৃতদেহের পোস্টমর্টেমের সময় তার পেটে হার না পাওয়ায়। তখন প্রশ্ন উঠেছিল দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই ছিনতাইকারীর সঙ্গী ছিল এবং সে পালিয়ে যেতে পেরেছে। 'সেকেণ্ড কালপ্রিট নিশ্চয় ছিল, সে অন্য রাস্তায় পালিয়েছে।'—তদন্তকারী দারোগা এক অনির্দেশ্যের উদ্দেশ্যে কথাগুলি উচ্চারণ করেছেন।

গল্পকার এরপর আমাদের কাছে সেই ছিনতাইকারীর অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে তার বিপরীতে উন্মত্ত জনতার অমানবিক হয়ে ওঠার চিত্র—

> ''দৌঁড়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটা সমস্ত কিছুর উপর হাল ছেড়ে দেয়। কোন লড়াই করেনি। পিছন ফিরে তাকায়নি। ফিরে তাকালে হয়ত প্রশ্নান্তরে যাওয়া যেত, সত্যাসত্যের বিচারে আসতে পারত শিবনাথরা। আসলে সারাদিনের রৌদ্র, রাত্রে থেকে যাওয়া সে উত্তাপের রেশ—ধেয়ে যাওয়া সমস্ত মানুষজনকে কুকুরের মতন খেপিয়ে তুলেছিল।''

—এই জনরব প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) উপন্যাসের উপকাহিনিতে যাদব কবিরাজের মৃত্যুর প্রসঙ্গ। ডাক্তার শশীর সঙ্গে

কবিরাজ যাদব বিতর্কে নেমে নিজের বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে বলে ফেলেছিলেন আগামী রথের দিনেই তার মৃত্যু হবে; এরকম আগাম বার্তা শশীর বিদ্যা দিতে পারবে না। এই খবর শশী থেকে কুসুম, কুসুম থেকে সমস্ত পাড়া, গ্রাম ও গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। নির্দিষ্ট দিনের বর্ণনা করে মানিক লিখেছিলেন—

> "রথের দুদিন আগে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, সেদিনও সকালের দিকে কখনও কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িল, কখনও মেঘলা করিয়া রহিল। আগের দিন সন্ধ্যা হইতেই সংকীর্তন আরম্ভ হইয়াছিল, সারারাত্রি এক মুহূর্ত বিরাম নাই। সকালবেলা নূতন নূতন লোক আসিয়া দল ভারী করিয়াছে, কীর্তন আরও জাঁকিয়া উঠিয়াছে। যাদব স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, সকলে ফুলের মালায় তাঁহাকে সাজাইয়াছে।"

—শশী যাদবকে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কিন্তু যাদব নিতান্ত মোহের বশবর্তী হয়ে তাতে রাজী হয়নি। প্রসঙ্গত সমালোচক ড. অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন—

> "—জনরব হয়ে ওঠে যাদবের নিয়তি। দু'বার, তাকে নিষ্কৃতির সুযোগ করে দিয়েছিল শশী। কিন্তু অন্ধভক্তির লোভে সেইসব সুযোগই উপেক্ষা করে যাদব। ... সেই অন্ধতার তাড়নায় যাদব ও তার স্ত্রী অফিম খেয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। এই হৃদয়হীন যুগ্ম-আত্মহত্যার মধ্যদিয়ে ঘটে যায় এক পরম সতীদাহ।"

—পীযূষবাবুকে এখানে অনায়াসেই বলা যায় মানিকের যথার্থ উত্তরসূরী।

বর্তমান সময়ের তরুণ কবি ও সমালোচক অধ্যাপক আব্দুস সালাম সমু তাঁর নিজস্ব ভাবনার আলোকে পীযূষবাবুর গল্পগুলি যথার্থ মূল্যায়ণ করেছেন। তিনি একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান আলোচনায় লিখেছেন—

"পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে এক ধরণের চাপা যৌনতা থাকে, সঙ্গে থাকে মিথের দেশীয় যাদুবাস্তবতা। দুয়ের সমবায়ে তাঁর গল্প প্রাণ পায়। এই চাবিকাঠির সাহায্যেই তাঁর গল্পের রহস্য উন্মোচন সম্ভব।"

—অধ্যাপক সালামের এই বক্তব্যে পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পের দুটি সুস্পষ্ট দিক উঠে এসেছে।

১. দেশীয় যাদুবাস্তবতা এবং

২. চাপা যৌনতা।

গল্পে শিবনাথ-মণিমালার নিঃসন্তান দাম্পত্য জীবনে সন্তান লাভের আকুলতায় তান্ত্রিক বাবাজির মন্ত্রপুত লকেট সংগ্রহ এদেশের নিজস্ব সংস্কার বিশ্বাসের যাদুবাস্তবতার দিক। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছিনতাইকারী যুবকটিকে অত্যন্ত অমানবিকভাবে পিটিয়ে মারার ক্ষেত্রে জনগনের রটনাই শেষ কথা— সেখানে মানুষের প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। প্রসঙ্গত লেখকের 'তালপাতার ঠাকুমা'র মত উপন্যাস সহ

অন্যান্য কিছু রচনাতেও এই বাস্তবতার পরিচয় আমরা পেয়ে যাই।

গল্পে যৌনতার দিকটি গল্প থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা যায়—

১. ছিনতাইকারী যুবকটির পরনের গেঞ্জির বিবরণ দিয়ে পীযূষ লিখেছেন—

"বহু ব্যবহৃত রঙিন গেঞ্জি—যাতে ছাপা ছিল উজ্জ্বল রঙের উদ্ধত নারী মূর্তি।"

২. হারটির ছিনতাই হবার সময় মণিমালা নিচু হয়ে টিউবওয়েলে জল পাম্প করছিল। সেই সময়ের বর্ণনায় দেখি—

"লকেটটি হারসহ দোল খাচ্ছিল ছিন্নমস্তা—মিনিয়েচার ফর্মেও যেন ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্তের গমকে দুলে উঠছিল বারবার। পুরুষ্ট স্তনে নখের আঁচড় থেকে রক্ত ঝরে গেছে কখন তার জানা নেই।"

৩. লকেট ছিনতাই হয়ে যাবার পর সকলে সান্ত্বনা দিয়ে যখন চলে গেছে তখন শিবনাথ-মণিমালার বর্ণনায় পীযূষ লেখেন—

"যখন সে (শিবনাথ) ঘরে আসে মণিমালাকে আর বসে থাকতে দেখেনি—কেননা মণিমালা আয়নার সামনে অনাবৃত স্তনে নখের আঁচড়ের শুকিয়ে যাওয়া রক্তপথ দেখছিল তখন।"

৪. হার ছিনতাইয়ের স্মৃতির মতোই মণিমালার বুকের বর্ণনায় গল্পকার লেখেন—

"ততদিনে মণিমালার স্তনে নখের আঁচড় শুকিয়ে মানচিত্রে নদী পথের মতন শাদা শাদা রেখার অস্তিত্বে পৌঁছে গেছে।"

৫. যৌনতার শেষ চিত্রটি গল্পে একটি বৃহত্তর জীবন ভাবনার উপকূলে পৌঁছে দেয় আমাদের। পীযূষ লিখেছেন—

"শিবনাথের মাঝরাতেও ঘুম আসে না, শুয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম নয়, ঘুমও। আসলে মণিমালার উন্মুক্ত স্তনের নদী রেখা ধরে একাকী এক নাবিক দাঁড় টেনে চলছে—এই রকমই মনে হয়।"

গল্পটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল লেখকের ইতিহাস চেতনা। যে ইতিহাস বোধের অনুরণন রয়েছে জীবনানন্দ দাশের কথায়—

"মহাবিশ্ব লোকের ইশরার থেকে উৎসারিত সময় চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতি সাধক অপরিহার্য সত্যের মতো। কবিতা লিখবার পথে অগ্রসর হয়ে এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি।"

—পীযূষের গল্পেও আমরা এই ইতিহাসের ইশারা টের পাই। গল্পের অন্তিমে রয়েছে সেই ইতিহাসের প্রতি লেখকের নিরপেক্ষ বীক্ষণ। ছিনতাইকারীকে সবচেয়ে মোক্ষম আঘাতটি দিয়েছিল যে রমণীমোহন "তাকিয়ে আছে দহের দিকে যেখানে হ্যাচ সাহেবের লবণের বজরা নোঙর ফেলত। এসব আড়াইশ বছর আগেকার কথা। নদী তখন নাব্যতা নিয়ে স্বাভাবিক। তারও আগে নদী অন্য খাতে বইত। সেই খাতের ধারা যে কবে বুকে বুজে এ

অঞ্চলের গোড়াপত্তন তার হিসাব পাওয়া যায় না''—এরই সঙ্গে লেখক অনাগত ভবিষ্যতের প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। আগামী দিনে হয়ত নদী আরও দক্ষিণে সরে গিয়ে দহের অস্তিত্ব মুছে যাবে। কয়েকশ' বছর পর যদি বোজা দহের তলদেশ থেকে ছিন্নমস্তার লকেটটাই উদ্ধার হয় তখনকার সভ্যতা বিস্মিত হবে না। 'তখন কোথায় মণিমালা, কোথায় তার মৃত সন্তানেরা, কোথায় বা এই অজ্ঞাত পরিচয়হীন যুবক। কারও কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না, শুধু পাওয়া যাবে নিজস্ব রক্তপানে একটি সভ্যতার ইতিহাস।'

—এভাবেই গল্পটি কালের গণ্ডি অতিক্রম করে যায়।

পীযূষের গল্পের বিষয়গত অভিনবত্বের সমান্তরালভাবে তার অঙ্গিকগত দিকটিও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁর ভাষার পরিমিতিবোধ, বিষয়ের অনুষঙ্গে উপমা-চিত্রকল্পের প্রয়োগ এবং নাটকীয়তা সৃষ্টিতেও গল্পকার তাঁর মৌলিকত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

সংযমী ভাষার নমুনা :

১. 'দেহ নিস্পন্দ না হওয়া পর্যন্ত আঘাত চলতেই থাকে।'

—ছিনতাইকারীকে হত্যার এই সংক্ষিপ্ত অথচ ক্ষুরধার বর্ণনা যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দেয়।

২. 'এই কলতলা—সকালের নিকানো উঠোন অবান্তর হয়ে যাচ্ছে।'

—মণিমালার জীবন বিপর্যয়ের এই বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও সংযমী।

৩. সংযমী ভাষায় পাশাপাশি গল্পকার তাঁর ভাষায় ইংরেজি শব্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন নানা প্রসঙ্গে—

''সেই রঙের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাহারি ফুলের চিত্রমালা, যা কী না কনট্রাসট লক্ষ করতো।'

'সবই ম্যানেজ করবেন'।ইত্যাদি।

নাটকীয়তা :

১. ''ঘাড়ের পিছনের আঘাতটাই মোক্ষম, পেশাদার। এক আঘাতেই শেষ, আগে পরের আঘাতগুলো সব ফালতু।''

—ডাক্তারের এই মন্তব্যে শিবনাথ চমকে উঠেছিল।

২. ''রমনীমোহনের চোখ দুটো ছোট, শিবনাথ দেখে এ কদিনে তা আরও কুচকে গেছে।''

—এই বর্ণনায় ছিনতাইকারীর প্রকৃত ঘাতকের পরিচয় স্থির হয়ে যায়।

উপমা-চিত্রকল্প :

১. ''শিবনাথের এই উচ্চারণের সাথে সাথে পেশী বহুল রাত্রি জাপটিয়ে ধরে সকলকে।''

২. ''আবেগ এমন সর্বনাশা যে, সে মণিমালার মৃত সন্তানের দৌড়ে রাস্তার বাঁক পার হতে দেখেন এবং তিনি শুনতে পান স্পষ্ট ডাক 'টুকু'। বিহ্বল অর্থহীন চোখে মণিমালার সন্তানদের খুঁজতে থাকেন।''

৩. ''যখনই ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল ছুঁড়ে ফেলছিল মৃতদেহ টপকে দহের জলে।.. একে অপরের থেকে একটু দূরত্বে চলে গেলেই নিজেদের হাতের নখের গভীরে রক্ত শুকিয়ে আছে কিনা দেখে নিতে চাইছিল।''

৪. ''যেখানে মৃত ছেলেটা পড়েছিল অবিকল সেরকম একজনকে পড়ে থাকতে দেখে। সে যতই এগিয়ে আসতে থাকে মানুষটা লম্বা হতে শুরু করে। একসময় রাস্তার এপার-ওপার হয়ে যায়।''

৫. ''এত সকালেই হাওয়া চাবকে ঘোরাচ্ছে মাটিকে, বোঝা যাচ্ছে শুরু হতে চলেছে আরও একটা রুক্ষ দিনের।''

—এরকম প্রয়োগ গল্পটিতে আরও অনেক রয়েছে।

পীযূষবাবু তাঁর এক মনোজ্ঞ আলোচনায় বলেছেন, তিনি কোন তত্ত্বকে ভেবে নিয়ে লেখা শুরু করেন না। লেখার পর পাঠক অনায়াসেই তাতে কোন না কোন তত্ত্ব পেয়ে যায়। এই গল্পেও সেই দেশজ বাস্তবতার তত্ত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়। এ হেন বলিষ্ঠ কথাকারকে বাংলা সাহিত্যের গুরুগৃহ—কলকাতা সমাদর করেনি। সেদিক থেকে তিনি যেন গুরুগৃহ থেকে নির্বাসিত 'অন্তেবাসী'। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পীযূষের প্রতিভার মূল্যায়ণ করতেই হবে ভাবীকালের গবেষক-সমালোচকদের।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প—'দহ'।
২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—পুতুলনাচের ইতিকথা।
৩. জীবনানন্দ দাশ—কবিতার কথা।
৪. ড. অশ্রুকুমার সিকদার—আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস।
৫. অলোক গোস্বামী (সম্পাদিত পত্রিকা)—গল্পবিশ্ব।
৬. শুভ্র মৈত্র (সম্পাদিত পত্রিকা)—রূপান্তরের পথে।

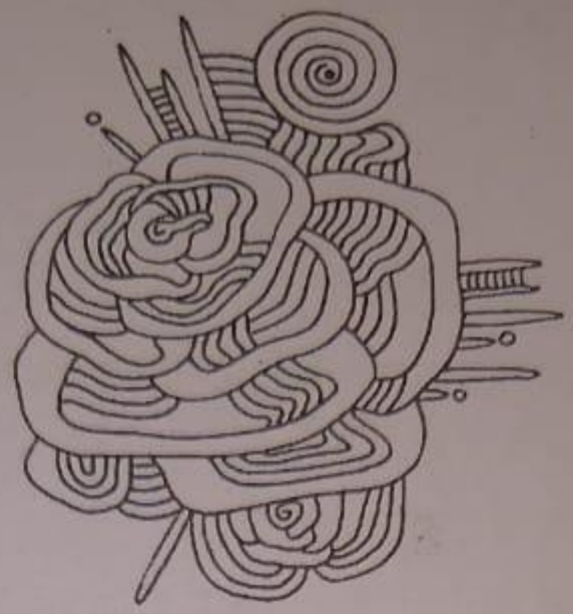

পীযূষ ভট্টাচার্যের 'তালপাতার ঠাকুমা' : এক আখ্যানের সহস্র গতিপথ

প্রলয় নাগ

"গদ্যকেও হয়ে উঠতে হবে বস্তুনিষ্ঠ। ছায়ার মতন জীবনকে অনুসরণ করে যাওয়া। গদ্যকারকে থাকতে হবে একটু তফাতে কেননা তার সৃষ্ট চরিত্রটি নিজের মতন ধরা দিক সময়ের কাছে। কেন না সত্য উদ্‌ঘাটন ছাড়া লেখকের কোনও দায়বদ্ধতা নেই" (উত্তর ভাষা'য় ডিসেম্বর ২০১৬তে প্রকাশিত পীযূষ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার) পীযূষ ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন পড়তে গিয়ে রীতিমতো নাকানি-চুবানি খেয়ে প্রতিবেদক হাতের কাছে উক্ত সাক্ষাৎকারে লেখকের স্বীকারোক্তিটুকু খুঁজে পেয়েছেন। কাহিনির মায়া বিভ্রমে অভ্যস্ত প্রতিবেদক যখন তাঁর প্রতিবেদনে পাতার পর পাতা চোখ বুলিয়ে কাহিনি খুঁজছে—

তখন রীতিমতো হতাশ হতে হয়েছে। এতো তো কাহিনির মায়াজাল নেই— যা আছে তা সাধারণ পাঠের বোধগম্য হতে কিছুটা সময় নেবে— কোথাও বা তা পাঠক মনে বিতৃষ্ণাও জাগাতে পারে। তা হোক! একজন প্রকৃত পাঠক কখনও কথককে হতাশ করতে পারেন না, তিনি যতই পথ ভোলানোর চেষ্টা করুন না কেন— প্রকৃত পাঠক তার থেকে নির্যাস খুঁজে আনবেই।

এতক্ষণ যে প্রতিবেদন নিয়ে কথা হচ্ছিল— তা 'তালপাতার ঠাকুমা'। লেখক পীযূষ ভট্টাচার্য। পীযূষ ভট্টাচার্য বাংলা কথন জগতে এক সুপরিচিত নাম। বিংশ শতকের শেষ দশক থেকে একবিংশ শতকের গোড়ার দিকে কথাসাহিত্যে তাঁর ব্যাপ্তি বিশালতা ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদনগুলি হল :

গল্পগ্রন্থ— (১) কুশপুত্তলিকা-১৯৯৫, (২) কীর্তিমুখ-২০০১, (৩) পদযাত্রায় একজন-২০০৪,
(৪) ঠাকুমার তালপাতা ও অন্যান্য গল্প-২০০৬,
(৫) শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন এবং তার মাদি মোষ-২০০৯,
(৬) কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড়ের পিঠ-২০১৩, (৭) জলের বর্গক্ষেত্র-২০১৬

উপন্যাস— (১) জীবিসঞ্চার-২০০১, (২) নিরক্ষরেখার বাইরে-২০০২,
(৩) তালপাতার ঠাকুমা-২০১২, (৪) সূর্য যখন মেষরাশিতে-২০১৩ ইত্যাদি।

'তালপাতার ঠাকুমা' আসলে কী আদৌ উপন্যাস না-কি অন্যকিছু। আমাদের পাঠক মন সর্বদা সহজ সরল বিভাজন, প্রকরণ খোঁজে। কিন্তু 'তালপাতার ঠাকুমা'র ক্ষেত্রে সে বিভাজন রীতি মানা না-মানা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। আসলে এই আখ্যান কাহিনির মেদ মাংস ঝরিয়ে-মহাসময়ের ফসিল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিবেদনটি পড়তে গিয়ে পাঠক ক্রমে জড়িয়ে পড়ে কাহিনির জটে। নিছক কোনও গল্প নয়, এই আখ্যানবৃত্তে প্রতিস্থাপিত হয়েছে— পূর্ব ইতিহাসের শেকড় থেকে বর্তমান সময় পর্ব।

প্রতিবেদনটির চারটি পর্ব। একটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো মনে হলেও তাদের ভেতর এক অন্তঃপ্রবাহ বয়ে চলেছে। বহু জিজ্ঞাসা ও অনিশ্চয়তা নিয়ে আখ্যান শুরু হচ্ছে "কেবলমাত্র ঠাকুমাই বিশ্বাস করতেন এমন এক পূর্বপুরুষের রক্তধারা এই বংশ বয়ে চলেছে তাকে কিনা কোনো একটি নির্দিষ্ট পাপের জন্য অভিশপ্ত হয়ে বেড়িয়ে পড়তে হয়েছিল নদীতে নৌকা ভাসিয়ে। জানা নেই, কোন সে পাপ সংঘটিত করেছিল জীবনে। ....ঠাকুমা আর মা বাড়িতে বসে বসে কোনো এক প্রচীনকাল থেকে প্রবাহমান আতঙ্কের ভিতর বেঁচে আছেন। এরা দু'জনই বিশ্বাস করে অজানা এক অপরাধের পাপ যেন জড়িয়ে সর্বাঙ্গে। তারা তাই কখনোই নদীর কাছে যায়নি, নদী থেকে দূর দূরত্বেই থেকে গেছেন" (পৃ: ৭)

যে বংশের কথা বলা হয়েছে, সে বংশে একমাত্র এই মা ঠাকুমা বাদ দিয়েই সকলের ভেতর হাতিকে ফুঁ দিয়ে নলের ভেতরে ঢুকিয়ে দেবার মিথটি প্রচলিত আছে।

এবং বংশানুক্রমে সেই বীরপুষের কথা মেনে বংশের মূলে সঞ্চারিত হয়ে এসেছে। এই মিথের প্রকৃত সময়টাও ধোঁয়াশায়। অনেকের মতে ব্রহ্মাপুত্রের বুকে সাজলী দ্বীপ সৃষ্টির সময়কালের বিষয় এটি আর আলবেরুনীর ভারততত্ত্বেও এর একটি ধারণা প্রচলিত আছে। লেখক কাহিনিকে কখনও ইতিহাসের গহ্বরে প্রতিস্থাপন করছেন, আবার তুলে আনছেন বিশ্বযুদ্ধ কবলিত সময়ে। সেজো দাদুর প্রসঙ্গ এসেছে এভাবেই। দুই যমজ সেজো দাদুর মধ্যে ছোটো সেজো দাদু মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীর পক্ষে মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত চলে গিয়ে সেনাবাহিনীর ট্রুপ থেকে পালিয়ে এক গ্রীক মহিলাকে বিয়ে করে চিঠি ও ছবি পাঠিয়েছিলেন। ছবি পাঠালেও আদৌ চিঠি পাঠিয়েছেন কি না কে জানে? কেননা, শরিকি সম্পত্তির লোভেই চিঠির কথা প্রচলিত হয়েছিল, লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর এই প্রসঙ্গে গ্রীক মহিলার ছবি দেখেই বাড়ির পুরুষেরা কামার্ত হয়ে ছুটে যায় তাদের পরস্পরের স্ত্রীর কাছে :

''সকলেই ছুঁটে ছিল যার যার স্ত্রীদের দিকে। বিরাট বাড়িটা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যার যার বৌকে খুঁজে নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল। কেউ রান্না ঘরের কপাট তুলে দিয়েছিল, কেউ ঠাকুর ঘরের, কেউ কুয়োতলায় বাতাবি লেবুর ঘনছায়া ভিতর.... সবার মুখে একই কথা— 'ছোটো একটা খাসা মাল বাগিয়েছে— দেখি আমার মালটা খাসা কিনা।'' (পৃষ্ঠা : ৯)

যার ফলস্বরূপ দশমাস দশদিন পর তেরোটি শিশু জন্ম নেয় বাড়িতে— এর মধ্যে চারজনের একই দিনে। তার মধ্যে একমাত্র পুত্র সন্তান কথকের পিতা।

আর এ সমস্ত কিছু জানা যেত না, যদি না কথক দাঁত ব্যাথায় কাতর হতেন। শরিকি সম্পত্তির চক্রান্তটা পরে কথকের দাদুভাই বুঝতে পারে। এটা কথকের ঠাকুমাই দাদুর মাথায় ঢুকিয়ে ছিলেন। তার ঠাকুমা সমস্ত ঘটনাটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন :

''তাই সেই স্নানের অছিলায় পুকুরে নেমেছিলেন। পুকুরের জলে তো সংবৎসর দেবী ঘুমিয়ে থাকেন কাঠামো সুদ্ধ— সে জল তো পবিত্র, পবিত্র জল গর্ভের জলের সঙ্গে মিশে গেলে পুত্র সন্তান তো হবেই।'' (পৃষ্ঠা : ১২)

এভাবে লেখক একের পর এক প্রসঙ্গ এনে আখ্যানে গতি দিয়েছেন। কথকের পিতার হাতি খোঁজার প্রসঙ্গ, খর্গের হঠাৎ তালপাখায় পরিণত হওয়া, ধেড়ে ইঁদুর নেংটি ইঁদুর— সর্বপরি বারোজন পিসির বর্ণনায় লেখক বলেছেন :

''বারোজন পিসি আর বাবাকে নিয়ে মোট তেরোজনের জন্মের পর একসময় সকলেই লক্ষ করে বারোজন মেয়ে একই রকম দেখতে। হুবহু ছোটো সেজ দাদুর পাঠানো গ্রিক মহিলার ছবির মতন।'' (পৃ: ১৫)

পরবর্তীতে এই পিসিদের জীবন আইবুড়ো হয়ে থাকা, বিষুদবারের খেলা ইত্যাদি প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে। যেগুলি আপাত ভাবে লেখক জাল বিছিয়ে গেলেও— তার ভেতর থেকে আমাদের চারপাশের সামাজিক চিহ্নায়িত দিকগুলিকে নির্দেশ করেছেন। আর এ আখ্যানের কোনও কিছুই ফেলনা নয়, সমস্ত কিছুই প্রয়োজনের। যেমন খড়্গ প্রয়োজনে তালপাখা হয়েছে— আর সেই তালপাখাও প্রয়োজনে উড়তে শিখেছে। কথকের পিতার সূত্রে হাতিকে

শান্ত করার প্রয়াস যেন রাজনৈতিক বাস্তবতাকে উন্মোচন করেছেন। আসলে, এই সময় কোন কিছু স্থির বা অবিশ্বাস্য নয়— লেখক যে বরাবর তার প্রতিবেদনে সে কথাই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

প্রতিবেদনটির দ্বিতীয় পর্ব 'বৃষ্টির ফোঁটার কোনো ব্যাসার্থ নেই'। অন্যভাবে বলতে পারি, কথক আর কাঞ্চনমালার আখ্যান। এখানে লেখক ইতিহাসের ভূগর্ভে নিমজ্জিত হলেন— যখন পর্তুগীজ নৌযান আঁছড়ে পড়ত এই ভূখণ্ডে। আসলে লেখক ঠিকই বলেছেন— এ কোনও কাহিনি নয়, বৃষ্টিবাধারার বিবরণী মাত্র। এই পর্বে বিশ্বাস অবিশ্বসের নানা প্রসঙ্গ তিনি এনেছেন। জাদুবাস্তবের আবহ নির্মাণ করেছেন পর্বটিতে। এখানে মানুষ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। আর এই মিলিয়ে যাবার মন্ত্র কথক লিখেছেন তার ঠাকুমার কাছ থেকে— কথকের কাছ থেকে শিখেছে কাঞ্চনমালা। আর মন্ত্রের জোরে কাঞ্চনমালাকে স্বামী হুজুর মাহাতোর হাত থেকে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন লেখক। যে কি না:

"…. তার ইয়ের মধ্যে একটি মৃত নদীর ম্যাপ, তার খতিয়ান পরচা সহ কাগজপত্র ঢুকিয়ে দিয়েছে। এসবের মধ্যে আছে এক মৃত নদীর শরীর খুবলে কালি তুলবার কথা।" (পৃষ্ঠা:৪৪)

আসলে লেখকের কল্পিত জাদুবাস্তবের সাহায্যেই আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় অবসন্ন, আক্রান্ত মানুষের সহজ সরল জীবনগুলো কিভাবে বদলে যাচ্ছে— তার মোকাবিলা করেছেন। তাই তালপাখা যেন সেই সর্বশক্তিমান অস্ত্র— যার দ্বারা এ সব বশে রাখা যায়।

নারী পুরুষের যে আবহমান খেলা, জোরজর্বদস্তি আর তাতেও সম্ভব না হলে— ধর্ষণের মতো পাশবিক অস্ত্রকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের হাতিয়ার করা— এসব যেন কাঞ্চনমালার মধ্যে দিয়ে তুলে এনেছেন। আর এসব বলতে নদীর জলের মতো লেখকের গদ্যের চলন ভাসতে ভাসতে কোথায় যেন হারিয়ে যায়:…. "টেলিফোন ওয়ানওয়ে হয়ে গেছে, কেবলই কাঞ্চনের কথা শুনতে পাচ্ছি। সে শুধু বলে চলেছে 'মরা নদীটা একটু জলের স্বাদ পাচ্ছে তাতে তোমাদের কেন গা-জ্বলছে বুঝতে পারছি না। নিজে তো দিব্যি আছো। খবরদার ঘর থেকে বের হবে না, এক হাটু জলে ডুবতে বসেছিলে. বৃষ্টি থামবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমারটা, এক হাটু জলে ডুবতে বসেছিলে। বৃষ্টি থামবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমারটা— এরপর কোনো কিছুই শোনা যায় না…।" (পৃষ্ঠা : ৫৮)

তৃতীয় পর্ব 'তীর্থযাত্রা পথে কিছু লিলিপুট'। সম্পূর্ণটাই ঠাকুমার কথা। ঠাকুমার অতীতের কথা। আর এই অতীত ইতিহাস উঠে আসে যখন কোনও অজানা ঘাটে পোর্তুগীজ বজরা আটকে যায়। এক অপরিচিত পুরুষ এসে ডাক দেয় 'ধলি' বলে। যে অনন্ত পণ্ডিতের ছেলে বলে নিজের পরিচয় দেয়। তাকে নাকি কুমীরে খায় নি, পোর্তুগীজরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল। আর যার তামাকের গন্ধ ঠাকুমাকে জাগিয়ে তুলেছিল। 'এই জনশূন্য গ্রামে নির্জনতার মধ্যে ঘুঘুর ডাকের মতন 'ধলি' বলে ডেকে উঠেছিল বলেই কিছুক্ষণ আগেই ধলিই তো হয়েছিল সে।' (পৃষ্ঠা: ৬৩)

আবার লেখক বলেছেন:

''মূল গল্প যেরকমই হোক তারই ভিতর ঢুকবে সে তার নিজের মতনই পথ তৈরি করে নেবে।'' (পৃ: ৬৬)

আর মূল গল্পটা বদলে দিয়ে লেখক যে পথ দেখিয়েছেন সেখানে ঠাকুমার ভূমিকা অন্যরকম। তিন আগন্তুক পুরুষ যার মধ্যে একজন অনন্ত পণ্ডিতের ছেলের মতন— এসেই ঠাকুমাকে 'ন্যাংটো' করে দেওয়ার হুকুম করে। আর দ্বিতীয় হুকুম আসার আগে ঠাকুমা নিজেই ন্যংটো হতে শুরু করে। এমনকী যখন দ্বিতীয় হুকুম আসে তা ঠাকুমা অগ্রাহ্য করে— 'যা করবি কর'- এই ভঙ্গীতে ঠায় দাঁড়িয়ে। আর এই ঠাকুমার দেহটা যেন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে:

''ঠাকুমার ন্যাংটো দেহটাই যে ক্রমশ বাড়ছে তা তারা বুঝতে পারে নি ঠিকঠাক প্রথমে। যখন বোঝে ততক্ষণে ঠাকুমার বিশাল উরুর মাঝখানে বন্দি। পিছন যে ফিরবে তার উপায় কই? পা দুটো লম্বা হতে হতে মোড়ের জিভ ভেংচে থাকা কালীকে এক লাথে উড়িয়ে দিতে উপক্রম।'' (পৃ: ৭০)

এই বিশাল দেহের কাছে আগন্তুক তিনজন যেন লিলিপুট। তারপর যে ঘটনাটি ঘটল— তাও যেন এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। প্রতিবাদের সংকেত। নারী শরীর যে ক্রমশ রণভূমিতে পরিণত হয় বা ধর্ষণের মতন অস্ত্রকে যারা বেছে নেয় তাদের রণনীতিটাও স্পষ্ট হয়েছে। ঠাকুমা যেন এক বিশালতা, ভূখণ্ড, দেশের প্রতীক হয়ে ওঠে। তখন তার মৃত্যুকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্তরে এক আলোড়ন ফেলে।

প্রতিবেদনটির চতুর্থ তথা শেষপর্ব 'পাতালের নদী মোহনায়'। ঠাকুমার বিশাল সে দেহটি তালবনে রাখা হয়েছিল— সে বনখানি যেন সর্বদা নজরে রাখেন তিনি। সমস্ত প্রতিবেদন জুড়ে ধর্ষণের মতো গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ঠাকুমার দেহ যেখানে রাখা হয়েছে সেখানেই এসে মহিলারা আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আর এই আত্মঘাতী মহিলারা যে সকলে ধর্ষিতা তা লেখক জানিয়ে দেন। আর যে তালবন নিয়ে এত কাণ্ড সেখানেও আগুন লাগে। শেষপর্যন্ত প্রতিবেদনটি আপাত সমাপ্তি হয় কথক কাঞ্চনমালার সুখী দাম্পত্য দিয়ে। কাঞ্চনমালার গর্ভে আসে কথকের সন্তান। কাঞ্চনমালাও চায় মন্ত্রের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে, যার মন্ত্র তাঁকে ফিরিয়ে দিতে : 'এভাবে বাঁচা যায় না।'

সবশেষে প্রতিবেদনটি বহুকিছুই অধরা রয়েগেল এই প্রতিবেদকের কাছে। হতে পারে তা প্রতিবেদকের পাঠ অক্ষমতা। তবে এই প্রতিবেদন আলাদা ক্ষেত্রের তা আন্দাজ করা যায়। ভাষা প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাত্রা— কথন শৈলীর নিজস্ব ধরণ ইত্যাদি প্রতিবেদনটিকে আলাদা গোত্রে নিয়ে ফেলে। দেশীয় সংস্কৃতি, মিথ কোথাও রূপকথার ধরণে জাদুবাস্তবতার প্রয়োগ প্রতিবেদনে বিশেষ ভাবেই সার্থক হয়ে উঠেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আকরগ্রন্থ: ১। 'তালপাতার ঠাকুমা'/পীযূষ ভট্টাচার্য, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা-৩২

সহায়ক পত্রিকা: ২। উত্তর ভাষা, ডিসেম্বর ২০১৬, শীত সংখ্যা, 'অন্তরঙ্গ পীযূষ'।

পীযূষ ভট্টাচার্য : মিথের জাদুকর

সো ম না থ ভট্টাচার্য

"তরাই-এর মেঘ গলিত ধাতুর মতো সগর্জন নেমে প্রতিমা ছাঁচে স্বর্ণমূর্তি হয়ে যায় হেমন্ত। পর্ণমোচী বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়তেই মনে হয়, পরিযায়ী পাখিদের আসবার সময় হয়ে গেছে। .... লেখা এভাবেই হয়। এভাবেই পৌঁছাতে চাই শিকড়ে। সব জীবনই তো দুঃখের। ভালোবাসাও দুঃখেরই। বলা যেতে পারে এ সত্যিকারের বেঁচে থাকার দুঃখ। পরজন্ম নিয়ে কোনো মাথাব্যাথা নেই। কেননা এজন্মেই তো বারবার করে জন্ম নিতে হচ্ছে।" এধরণের কথকতা বাংলা সাহিত্যে এক ধরণের ব্যতিক্রমী ধারার জন্ম দিয়েছে। তাদের আখ্যানের ভাষা প্রবহমান ভাষার সমান্তরালে সৃষ্টি করে নিজস্ব চারণভূমি। পীযূষ ভট্টাচার্য হলেন সেই ধরণের ব্যতিক্রমী লেখক যারা 'যেমন দেখি তেমন লিখি'দের দলে পড়েন না। তিনি সময়হারা হয়েও সময় চিহ্নিত, প্রত্যাশিত ছক ভেঙে আত্মনির্মাণের

পথিক হতে চেয়েছেন। স্বদেশ, পরিচিত পরিবেশ, দেশ-কালের গণ্ডী পেরিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন স্বদৃষ্ট এক মায়াবিশ্ব বা চেতনালোকের দিশারী। পীযূষ ভট্টাচার্য তার নিজস্বতা ও ব্যতিক্রমী ধারা বজায় রেখে বাংলা ছোট গল্পে তথাকথিত জনপ্রিয় না হয়েও একধরণের সম্ভ্রম আদায় করে নিতে পেরেছেন বহুপাঠকের কাছে। আসলে সব ধরণের সাহিত্য তো সবার জন্য নয়, কারো ভালো লাগে কাব্য, কারো বা গল্প-উপন্যাস, কেউ বা আবার প্রবন্ধ অথবা গবেষণাধর্মী লেখার ভক্ত। এর মধ্যেও ভাগ রয়েছে— কারো পছন্দ সহজ সরল ঘটনাক্রম ও ভাষা, কেউবা সাহিত্যে ফল্গুরসের ধারার সন্ধানে কেবলই অক্লান্ত ভাবে খুঁড়ে চলেন। জীবনযুদ্ধে বিধ্বস্ত নায়কের মত নিকষ অন্ধকার সমুদ্রে একাকী বাতিঘরের সন্ধান করতে করতে হঠাৎ করেই চোখ পড়ে যায় লাইট হাউস। পীযূষ ভট্টাচার্যের সাহিত্যের পাঠক নির্দিষ্ট মুষ্টিমেয়, যারা সাহিত্যের বহিঃরঙ্গের মধ্যে সন্ধান করেন ফল্গুধারার। লেখকের সাহিত্যে হাতেখড়ি কবিতা দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীকালে মূলত ছোট গল্প রচনাতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার প্রকাশিত পাঁচটি উপন্যাসেই তিনি দক্ষতার সাথে পাঠকদের মন জয় করে নিয়েছেন।গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ছাড়াও অনেক ছোট গল্প, উপন্যাস বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাকায় প্রকাশ পেয়েছে। আশির দশকের শুরুতে লেখা শুরু, নব্বই-এর দশকের প্রথমে কাব্যগ্রন্থ 'মহিন্ন অসুখ মহিন্ন যন্ত্রণা' (১৯৯১) প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। তারপর থেকে আরো এগারটি গল্প সংকলন, চারটি উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। প্রতিটি রচনাতেই বিকল্প ভাবনার ছাপ স্পষ্ট। রাজ্য সরকারি দপ্তরের কর্মচারী হিসেবে পেশাগত জীবনে বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে বাস্তব ও কল্পনার টানাপোড়েনে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছেন দৃঢ় মানসিকতায়। 'রহু চণ্ডালের হাড়' এর স্রষ্টা অভিজিৎ সেনের সঙ্গে ছিল তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জন্মস্থান বালুরঘাটে হলেও শৈশবের অনেকটা সময় কেটেছে কলকাতা, দার্জিলিং ও বাংলাদেশে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সংস্থা থেকে বহু সম্মান তিনি লাভ করেছেন। বালুরঘাটে সাহিত্যচর্চা করে তিনি সময় থেকে অনেকটাই নিজেকে চিন্তা চেতনার জগতে অগ্রবর্তী রাখতে পেরেছেন। পীযূষ ভট্টাচার্যের অনেক গল্পের মধ্যে 'নির্বাচিত গল্প' দীপ প্রকাশন থেকে প্রায় দেড়দশক আগে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে লেখা এই গল্পগুলির মধ্যে লেখকের সাহিত্যশৈলীর কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও রচনাগুলি সময়ানুসারে সজ্জিত নয়, তবুও আশির দশকের শেষ থেকে শুরু করে একবিংশ শতকের গোড়ার দিকের রচিত এই সাহিত্যসমূহ। প্রায় দু-দশকের সময়ে সৃষ্ট তাঁর এই নির্বাচিত গল্প সংকলন। কুড়িটি গল্পেই লক্ষ্য করা যায় কথক হিসেবে লেখক এক বিকল্প সাহিত্যভূমির সন্ধান আমাদের দিয়েছেন। 'ভাসান' গল্পে গ্রাম্য পরিবেশ ও গ্রাম্য কথকতা এককার হয়ে যায়।গ্রামের উৎসব বা মেলাকে কেন্দ্র করে লোক সংস্কৃতির ধারাকে লেখক বহমান দেখাতে চেয়েছেন। যেখানে ভাষা শহুরে ভাষার চাইতে ভিন্নমাত্রা নিয়ে আসে।নববিবাহিত বিনি আর বিভাস মণ্ডল সন্তান কামনায় মানত করে, তাদের খোলামেলা

সহজ কথোপকথন পাঠকের মনকে অনাবিল নিস্তরঙ্গ পরিবেশে নিয়ে যায়। ''যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠতে উঠতে মহিলা বিনির হাতদুটো শাঁখারির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, ঠিকমতন পড়াস, বাপু, এই দ্যাখ কেমন মাংসল হাত। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বিভাসকে দেখে চোখ মটকে হাসে। বিনিও অবলীলায় দশ-বারোজনকে টপকে হাতে শাঁখা পড়তে থাকে।

কাছে আসায় বিভাস চিনতে পাররে, এ হচ্ছে দিদিশাশুড়ি, রক্ত সম্পর্কের নয়। 'আরে আমার কচি লাগর দেখি' বলে বিভাসের থুতনি নেড়ে দেয়। নড়বড়ে ঢিলে চামড়ায় হাতটির দিকে তাকিয়ে বিভাসও চমকে ওঠে, এতো জোর। তবুও শাস্ত্রসম্মত হাসি হেসে বলে, শরীর কেমন আছে? তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছি তবু আমার শরীরের খোঁজ নেয়রে জামাই— কাঁপা কাঁপা গলায় ফোকলাগালে হাসে। তার সিঁদুরে সিঁদুরে ছয়লাপ মাথাটা কাত করে বিনিকে দেখে নিয়ে সুর করে গেয়ে ওঠে—

আশনাই না জমে সাঁঝের বেলায়
সাঁঝ পোহালে বোস এই দাওয়ায়।
পাছা নাচিয়ে বিনিকে বলে নিয়ে যাস একদিন।''

একইভাবে 'মাছ' গল্পটিতে গ্রামীণ জেলেদের জীবনের করুণ ও রোমাঞ্চকর দিনলিপির বর্ণনা পাই। নিত্য আর শচী দুই বন্ধুর মাছ ধরার জন্য গ্রামীণ আয়োজনের ফাঁক গলে জীবন সংগ্রামের গল্প টুপ করে ঝরে পড়ে। ওপার বাংলার স্মৃতি ঘিরে শচীর কল্পনা আর বাস্তবের মাঝে বিরাট এক শূন্যতা বিরাজ করে। ''নদীর বুক থেকে উঠে আসা ঠাণ্ডা বাতাস নিত্যকে সম্মোহিত করে ডাকে। অন্ধকার নদী তখন অনন্যরূপে বইছে। নিত্যকে বেছে নিতে হয় গভীর অন্ধকার, যাতে কোনো রকম বিশ্বাসঘাতকতায়, ফাঁদে কিম্বা জালে আটকে না পড়ে। সে নদীর কাছে উঠে আসে। দাওয়াতে নেমেই ঘুমন্ত ছাগীকে লাথি মেরে জাগিয়ে দেয়। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ভাবে তাদের সাহায্য করার কেউ নেই। সে দ্রুত নদীর বুকে নেমে আসে। শচীর নাম ধরে ডাক দেয়। প্রতিধ্বনি ফিরে আসবার পরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে উত্তরের জন্য। তারপর সে চলতে শুরু করে। নদীর বানের টানে সে চলেছে।'' শচী স্বপ্নে নদীতে মাছ ধরে চলে, মাছ তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যায়। এ যেন জীবনের হিসেব নিকেষ মেলাবার সেই পুরোনো অঙ্ক কষা— গরীব মানুষ শুধু স্বপ্নই দেখে। সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে ভেবেই সে কাটিয়ে দেয় গোটা জীবন।

'ক্ষরণ' গল্পে আমরা পাই এক নারী চরিত্রকে, যে এক লম্পট পুরুষের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে প্রতিশোধের কামনায় কালাতিপাত করে। দাদা-বৌদির সংসারে বোঝা হয়ে সে নিজেকে আপন বৃত্তে বেঁধে রাখতে চায়। কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন সেই পাড়ায় ধর্ষকটি কারো হাতে খুন হয়ে যায়। শকুনের আনাগোনায় জানা যায় সে সংবাদ। ধর্ষিতা রীতা এই খবরে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নিজের মুখ ক্ষতবিক্ষত করে। তার আপশোষ হয়, সে নিজে কেন তার ধর্ষণকারীকে হত্যা করতে পারল না এই ভেবে। গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের চিরাচরিত

সাংসারিক টানাপোড়েনের ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন নিখুঁতভাবে।

পীযূষ ভট্টাচার্যের কলমে গল্পগুলোর অন্দরে যেন আরো একটি গল্পের সন্ধান করে পাঠক।প্রায় সব গল্পেই থাকে ছাপোষা জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনার মধ্যে নানান তথ্য। যেসব তথ্য আমাদের আটপৌড়ে জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে কোথাও না কোথাও কোনভাবে জড়িয়ে থাকে। 'গারসি সংক্রান্তির কাক' গল্পে অশক্ত-শরীরে কবিরাজ সুধীন তার চিরাচরিত প্রথামাফিক কাকবলি'র ব্যবস্থা বাড়িতে এখনও চালু রেখেছে। স্ত্রী কণিকা পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে ঘি-ভাত মেখে দলা করে দেওয়ালে রাখে। পূর্বপুরুষরা কাক হয়ে এসে সেই অন্ন গ্রহণ করে। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে এভাবে কাকেদের উদ্দেশ্যে খাবার দেবার প্রথা গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে একসময় প্রচলিত ছিল। লেখক খুব সুন্দরভাবে তার বর্ণনায় সেই সংস্কারগুলো মনে করিয়ে দিয়েছেন। গল্পে অনেক ধরণের ঔষধী গাছের সাথে পাঠকের পরিচিতি ঘটে। ''পাঁচিলটা সাবেকি, হাল ফ্যাসানের জাফরি দেওয়া নীচু নয়। একেবারে ম্যান হাইট। পাঁচিলের এপারে একপাশ ঘেঁষে অর্জুন, কালমেঘ, বামুনহাটি, হাড়জোড়া, ক্ষেত পাপড়ার বাগান। আয়ুর্বেদে আশ্চর্য টান মানুষটার। দৃষ্টির ঠিকঠাক শিক্ষা নেই যে সঠিক গাছ গাছড়া চিনবে।....অন্নদামঙ্গলে আছে : ঈশের মূল হাতে বৈদ্য উত্তরিলগিয়া/ মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া।/বাঘছাল খসিয়া উলঙ্গ হইল হর। এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর।/ মেনকা দেখিয়া চেয়ে জামাই লেঙ্গটা/প্রদীপ নিবায়ে দেয় টানিয়া ঘোমটা।''

'দণ্ডকলসের ফুল' গল্পে বাবলু কবিরাজি, টোটকা, ঝাড়ফুঁক করে গ্রামের লোকের আস্থা অর্জন করেছে। কিন্তু সেই টোটকা দিয়ে চিকিৎসা করানোর দ্বন্দ্বে নিজের সাপেকাটা ছেলেকে সে হারায়। সেই শোকে তার পাগল হার উপক্রম। একদিকে তার পেশা যাতে বিশ্বাস করে তার টিকে থাকা, অপরদিকে আধুনিক চিকিৎসার সাহায্য নিতে গিয়ে ছেলে হারাবার জ্বলন্ত শোক। দাদাকে বাঁচাতে ছাত্রবস্থায় তাকে পুলিশী অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। বহু বছর পর সেই দাদার রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিও যথেষ্ঠ। বিমল তার নিজের ছেলের মৃত্যুশোক সামলাবার বহু চেষ্টা করে, কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তারের চিকিৎসা বিভ্রাটে ক্রোধান্বিত হয়ে ডাক্তারের উপর আক্রমণ করে। ডাক্তারদের চাপে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে, এমন পরিস্থিতিতে দাদা তার রাজনৈতিক প্রভাব দিয়ে বিষয়টিকে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে। গল্পে দণ্ডকলসের ফুলের উল্লেখ তাৎপর্যবাহী।গ্রামীণ টোটকা ব্যবস্থায় দণ্ডকলসের ফুল সাপেকাটা রোগে কাজ দেয় বলে বিশ্বাস, যদিও এর কোন ভিত্তি নেই। এখানেও লেখক বিমলের দুটি সত্তার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।প্রতিটি মানুষের মধ্যে পৃথক দ্বৈতসত্তার অস্তিত্ব থাকে, তার মধ্যে দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে সে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

তাঁর গল্পগুলো অন্য অনেক গল্পকারের মত সমস্ত ব্যকরণ মেনে কোনও নির্দেশ মেনে চলে না। পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পের শেষে কিছু প্রশ্ন রয়েই যায়— সে প্রশ্ন সমাজ না

পাঠকদের উদ্দেশ্যে তা বুঝে নিতে হয়। এমনই এক গল্প সমসাময়িক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে, বাবরি সমজিদ ধ্বংস হবার প্রেক্ষিতে 'পচন প্রক্রিয়া'। হিন্দু সুকমলের মুসলিম স্ত্রী জাহানারা বিয়ের পর নিবেদিতা নামকরণ হলেও তার নিজের আইডেন্টেটি ক্রাইসিস রয়েছে। হিন্দু পাড়ায় বসবাস, হিন্দু ধর্মের প্রতিবেশিদের সাথে একাত্ম হতে গিয়েও সে বারবার উপলব্ধি করে য়ে ধর্মান্তরিত হলেও অন্যান্য প্রতিবেশিদের সমগোত্র নয়। বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো বা হিন্দু ধর্মীয় আচার পালন করতে চাইলেও জাহানারা নিবেদিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন তাই নিবেদিতার মধ্যে জাহানারা সত্ত্ব বার বার প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় সমাজের কাছে তার সন্তানকে হত্যা করা হবে কিনা? তাদের পুকুরে কে বা কারা রাতের অন্ধকারে বিষ ঢেলে দিয়ে সব মাছ মেরে ফেলে। সেই মাছের পচনের গন্ধ জাহানারার নাকে এসে লাগে মাঝে মাঝেই।

ছোট গল্প নিয়ে বহু ব্যাখ্যা শোনা যায়, ঠিক কাকে ছোট গল্প বলা যাবে। কোন্ কোন্ গুণ থাকলে ছোট গল্প তার কৌলিন্য বজায় রাখতে পারবে— এসব নিয়ে অনেক চুলচেরা বিশ্লেষণ অতীতে যেমন হয়েছে, ভবিষ্যতেও চলবে। কিন্তু সে সব বাদ দিয়েও বলা যায় ছোট গল্পের বোধ হয় কোন ব্যকরণ হয়না। কারণ বিগত একশ বছরে গোটা বিশ্বে ছোট গল্পের ফর্ম নিয়ে বহু পরীক্ষা নীরিক্ষা চলেছে, বর্তমানেও চলছে। পীযূষ ভট্টাচার্যের ছোট গল্প যেন সেসব ব্যকরণ ভাঙতেই এক নুতন ফর্ম সৃষ্টি করেছে। ''জ্যোৎস্নালোকে হুইল চেয়ার'' গল্পটি সেই ধরণের এক নুতন প্রশ্নের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়েছে। ঠিক যেন গদ্যকবিতা, অথচ এটা গল্পই। চমৎকার ভাষার কারুকার্য রয়েছে এতে, ''চাঁদ তো প্রতিমাসেই মরে যায়, আবার বেঁচেও ওঠে ছায়া ছাড়িয়ে নুতন ভাবে। প্রতিনিয়ত নিজের ল্যাজ নিজেই কামড়ে অন্তিম প্রয়াসের মধ্যে এক সময়ে আজকের মতন এরকম একটা পরিপূর্ণ চাঁদও প্রবীণ রাত্রির আকাশে ওঠে। জ্যোৎস্নার স্তম্ভিত সৌন্দের্যের মধ্যে লক্ষ একটা সাপ শরীর থেকে খোলস ছড়াচ্ছে জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে আর জ্যোৎস্না ক্রমান্বয়ে পিছলে যাচ্ছে সরীসৃপ শরীরে।''

'দহ' গল্পটিতে শিবনাথের মনে একাধারে লোভ ও ভয় কাজ করে চলে। মৃতর্বৎসা স্ত্রীর জন্য বহু কষ্টে তান্ত্রিকের মন্ত্রপূত লকেট আড়াই ভরি সোনা দিয়ে বানিয়ে নেয় সে। যদি এটা পড়ে বউ সন্তান জন্ম দিতে পারে। কিন্তু একদিন সে হার ছিনতাই হয়ে যায়। সন্দেহের বশে এক যুবককে গণধোলাইয়ে খুন করে ফেলা হয়, কিন্তু তার কাছে চুরি যাওয়া হার মেলে না। নৃশংসতার চরম নিদর্শন লক্ষ্য করা যায় পরবর্তীধাপে। এমন ঘটনা বর্তমান যুগে হামেশাই ঘটে চলেছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার আশীর্বাদ ধন্য হলেই সাত খুন মাপ হয়ে যায় আমাদের সমাজে। শুধুমাত্র আমাদের সন্দেহের বশে অনেক অন্যায় সমাজে ঘটে চলেছে, এসব ক্ষেত্রে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। নদীর দহে যেখানে গণধোলাই-এ মৃত যুবকটির লাশ পড়েছিল সেখানে অপরাধী মন ধরা পরে।

"এসব আড়ইশ বছর আগেকার কথা। নদী তখন নাব্যতা নিয়ে স্বাভাবিক। তারও আগে নদী অন্যখাতে বইত। সেই খাতের ধারা যে কবে বুজে এ অঞ্চলের গোড়াপত্তন, তার হিসাব পাওয়া যায় না। আগামীতে নদী হয়তো অনেক দূরে সরে যাবে, মুছে যাবে এ দেহের অস্তিত্ব। যদি কয়েক'শ বছর পর বোজা দহের তলদেশ থেকে উঠে আসে ছিন্নমস্তার লকেট, তখনকার সভ্যতা কী অবাক বিস্ময়ে দেখবে না, এক নিরাবরণ দেবী নিজের মস্তক ছিন্ন করে নিজের রক্ত পান করছে। তখন কোথায় মণিমালা, কোথায় তার মৃত সন্তানেরা, কোথায় বা অজ্ঞাত পরিচয়হীন যুবক। কারো কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু পাওয়া যাবে নিজস্ব রক্তপানে একটি সভ্যতার ইতিহাস।" এই প্রশ্ন সামগ্রিকভাবে তথাকথিত সভ্য মানুষকে নিশ্চয় ভাবতে বাধ্য করবে।

বর্তমান ঘুণধরা সমাজ ব্যবস্থায় রাজনীতি হারিয়ে ফেলে আদর্শবোধ। তবুও আপনগতিতে কিছু মানুষেরা পুরোনো আদর্শ ও নিজস্ব জীবন চর্যায় কালাতিপাত করে 'কীর্তিমুখ' গল্পে যে শান্তনু পার্টির কাজে সংগ্রাম আন্দোলনে জেল খাটে। জেল থেকে বার হয়ে যে অন্য এক পার্টি আদর্শবোধ লক্ষ্য করে, শ্রেণি শত্রু তখন বন্ধুর ভূমিকায়। চেনা পরিবেশ তখন অচেনা ঠেকে তার কাছে। পুরোনো পরিবেশ ছেড়ে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চায় শান্তনু। তার স্ত্রী গীতার আশ্রয়ে নুতনভাবে জীবন শুরু করার কথা ভাবতে থাকে সে। শাশ্বত প্রেম বাঁচিয়ে রাখে শান্তনুকে। পুরোনো আনেক কিছুই পাল্টে গেলেও গরীব মানুষের মধ্যে সেই আদর্শবোধকে আবার প্রত্যক্ষ করে শান্তনু।

দুই বাংলার সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়ার দু'পার ঘিরে জনজাতির বাস। তাদের জীবন যন্ত্রণার এক অন্য ছবি আমরা পাই অনবদ্য এক গল্পে। "সীমান্ত শেষের যাত্রা"-র যে ছবি পীযূষ ভট্টাচার্যর কলমে উঠে এসেছে, তাতে দুই বাংলার সীমান্তবাসী বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষদের যাপনচিত্র উঠে এসেছে। কাঁটাতারের বেড়া ছাড়াও দুই সীমান্তে নদী অনেক জায়গাতেই সীমান্তের ভূমিকা পালন করে এরাজ্যে। প্রতিবেশী দেশের সাথে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত এত মিল থাকার কারণে বহু এলাকাতেই একাকার হয়ে গেছে সীমান্তের বেড়াজাল। বিশেষ করে জেলেদের জীবনে মাছ ধরতে গিয়ে প্রতিবেশী দু-দেশের মধ্যে অন্দরে প্রবেশ প্রায়শই ঘটে থাকে। একারণে অনেক সময়ই জেল জরিমানার ঘটনা ঘটে। আর সীমান্তে বি,এস,এফ অথবা বি,ডি,আর ফোর্সের সাথে চোরাচালানকারীদের সখ্যতা-বৈরীতা অনেক ক্ষেত্রেই নানান ঘটনাক্রমের সৃষ্টি করে। "অগির ছোটটানটি নগিনকে হঠাৎ এক হ্যাচকায় ফেলে দেয় আর একটু হলেই ডিঙিই উল্টে যেত। টালমাটাল অবস্থায় লক্ষ্মীর গায়ের মাখা খালি পাউডারের কৌটোতে পেঁচানো সুতো, তা গলুইয়ে পড়ে হু হু করে সুতো সহ মাছ ছুটতে থাকে নদীর উজান পথে। শ্রী এখন কৌটিল্য হারিয়ে চিরি নদী হয়েছে— প্রথম বর্ষায় কিছুটা শরীর স্বাস্থ্য ফিরে পেতেই নগিনরা ডিঙি ভাসিয়ে তাগি ফেলে মাছ ধরে। উজানের কোন মাছ যদি সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসে এই আশায়। দুরন্ত

গতিতে ডিঙি ছুটে সীমান্ত চৌকিকে ফাঁকি দিয়ে ওপারে মিলিয়ে যায় ডিঙি।'' লেখকের জন্ম থেকেই যে নদীর সাথে সখ্যতা গড়ে উঠেছিল, তা তাঁর বহু লেখায় উপলব্ধি করা যায়। নদীকে ভালো না বাসলে এমন সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় না। সীমান্তের মানুষদের অনিশ্চিত কাঠিন জীবনের প্রতিটা বাঁকে ফাঁদ পেতে রাখে মৃত্যু। জীবনকে বাজি রেখে তারা জীবিকার সংগ্রামে দিনাতিপাত করে।

''শূন্য বাঙ্কারে অনন্তর চোরাই গরু দেখে নগিন বলেছিল, তেনারা তবে পজিশন নেন কিভাবে?

অনন্ত অবিশ্বাসের হাসির গমক তুলে বলেছিল দ্যাখ কবর খুইড়া এক গোছা বালও যদি পাস। গরুগুলি অপেক্ষা করে সেভেনটি সেভেন ব্যাটেলিয়ানের সিগনালের। নগিনের তিন কেস হয়ে গেল। এক সন্ধ্যায় সুখেন তিন মোহনা কাঁপিয়ে লেকচার ঝাড়ে চায়ের দোকানে বসে, শালা সেই ব্লু ফিল্মটার মতন বাড়ির সামনে দিয়ে মাসি যাচ্ছে সেই কাপড়চোপড় খুলে একদম উদোম হয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়েছে আর ঠাপানোবালা ভুতের সঙ্গে ঠাপাচ্ছে, ভূত দেখবার পাচ্ছি না কিন্তুক শালা ঠাপ খাচ্ছে, মাগী, বোঝা যাচ্ছে ঠাপানো না দেখলি আশ মেটে, উঃ অবস্থা মাইরী।''

একইভাবে 'স্বর্ণময়ী' গল্পে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে কিভাবে চোরাচালানের কারবার চলে তার বেশ কিছু ছবি উঠে আসে। গল্পটিতে লেখকের বর্ণনার ভঙ্গীটি পাঠককে হাজির করিয়ে দেয় ঘটনাস্থলে। পাঠকও হয়ে ওঠে গল্পের একজন কুশিলব। এখানেই পীযূষ ভট্টাচার্যের মন্সিয়ানা। কাঁটাতারের বেড়া টপকে সীমান্তরক্ষী পুলিশ সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে সোনা পাচারের কারবার হয় তার খণ্ডচিত্র তিনি গল্পে এঁকেছেন। কিভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গরীব মানুষদের এসবকাজে ব্যবহার করা হয় তার মর্মস্পর্শী ঘটনার কথা বিবৃত হয়েছে গল্পে। অনিল বি,এস,এফের গুলিতে মারা গেলে পাঁচ লাখ টাকার মাল রেড হয়ে যায়। তার অসহায় স্ত্রী কন্যাদের ব্ল্যাকমেল করে মেয়েকে কিভাবে এই পাচারচক্রে দাদালরা সামিল করায় সে কাহিনীর অপর্ব চিত্র লেখক এঁকেছেন।

গ্রাম বাংলার কথা লেখকের প্রায় প্রতিটি গল্পে উঠে এসেছে। নানা ঘটনাক্রমে গ্রামের মানুষের সরলতা, মূল্যবোধের ভাবনাকে লেখক তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। 'চক্ষুদান' গল্পে সত্যেন গ্রামের বার্ধিষ্ণু পরিবারের সম্ভবত জমিদার বাড়ির ছেলে, যে শহরে কোলতাকায় থাকে। তাদের দেশের বাড়িতে দুর্গাপূজা হয়। মূর্তিতে চক্ষুদান ফি বছর সেই করে থাকে। ঘরবাড়ি সব দেখভাল করবার দায়িত্ব মানিকের বাবা-মার, যারা দীর্ঘকাল ধরে সত্যেনদের ভাগচাষী। মানিকের জলে ডুবে মৃত্যু হয় রহস্যজনক ভাবে। তারপরের বছর সত্যেনের দুর্গাপূজায় এসে বারবার মানিকের কথা মনে হয়। তার পুকুরে পড়ে যাওয়া সোনার আংটি তুলতে গিয়ে যে মানিকের মৃত্যু সেটা একমাত্র সে ছাড়া কেউ জানে না। সত্যেনই তাকে পুকুরে নেমে আংটিটা তুলে আনতে বলে। মনে মনে তার

তাকে কুরে কুরে খায়। শহরের পরিবেশে বসবাস করলেও সত্যেনের সরলতা, মূল্যবোধ মানিকের বাবা-মার সঙ্গে তুলনীয়। তবুও শেষ পর্যন্ত সত্যেন প্রকৃত ঘটনার কথা ওদের বলতে পারে না। এখানে- গ্রাম্য ও শহুরে মানসিকতার দ্বন্দ্বে লেখকের শেষ পর্যন্ত একটি স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে হয়। একাজে তিনি দ্বিধাহীনভাবে তার অবস্থান স্পষ্ট করেন। সমাজে ঘটে চলা ঘটনাবলীকে কল্প ও ভাষার মোড়কে পাঠকের মননেপৌঁছে দেওয়াই তো কথকের কাজ। পীযূষ ভট্টাচার্য এই কাজে নিজেকে প্রমাণ করেছেন বারবার। তবে তার গল্পকে সকলের জন্য বা শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের জন্য নয়। তার গল্প সমকালের দর্পণ হয়ে ধরা দিয়েছে অনেকক্ষেত্রে। 'বোধনপর্ব' একাধারে আদিবাসী ও প্রান্তিক সমাজের মানুষদের মূলস্রোতে মেলানোর সরকারী পরিকল্পনার সাথে বাস্তবের ফারাকটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সেখানে সত্যসুন্দরের মতো আদর্শবাদী বামপন্থী নেতা মন্ত্রীরাও আপন স্বার্থসিদ্ধি করতে মূল্যবোধকে বলি দিতে কুণ্ঠিত হয়না। সরকারী পরিকল্পনা দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য। কিন্তু স্বজনপোষণ বলে যে শব্দটার সৃষ্টি তা থেকে মুক্ত থাকা কঠিন কাজ। আর এই কঠিন কাজ যতদিন ধরে আদর্শবোধকে সদাজাগ্রত রাখা সম্ভব হয় ততদিন পর্যন্তই তারা টিকে থাকে। আদর্শবোধের মৃত্যু হলে ধীরে ধীরে পতন হয় ক্ষমতাসীনের।

পীযূষ ভট্টাচার্য তাঁর অকপট কথনে কখনও ভয় পাননি। নিজে বামপন্থায় বিশ্বাসী হয়েও বামপন্থার আদর্শচ্যুতি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর সাহিত্যে তিনি বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে ভোটসর্বস্ব বামপন্থার প্রতি তাঁর তীব্র কশাঘাত বামপন্থার আদর্শবোধেরই জয়ধ্বজা তুলে ধরে। সমাজের প্রান্তিক মানুষ, আদিবাসী, ক্ষেতমজুর এদের কথা তাঁর গল্পে তাই উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, প্রায় সব গল্পের পরিণতি ঘটেছে মানবিক মূল্যবোধকে উচ্চাসনে রেখে। 'টুটু এখন হালুম বলছে' গল্পেও যৌনকর্মীদের কিছু ঘটনাক্রমে কথনের পর একই ভাবে মানবিক মূল্যবোধকে তিনি সবার উপরে স্থান দিতে চেয়েছেন। এখানেই পীযূষের নিজস্বতা, যা তাঁকে অন্য অনেক লেখকদের থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। যাঁর কলমে আপোষ শব্দটি বড়ই বেমানান। এখানেই তিনি অনন্য।

পীযূষ ভট্টাচার্য : জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি

জন্ম : ৩ ডিসেম্বর ১৯৪৬
জন্মস্থান : বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর (মামাবাড়ি)
শৈশব কেটেছে : কতকাতার চিৎপুরে, অধুনা বাংলাদেশের নীলফামারী এবং দার্জিলিং জেলার সোনাদায়, ১৯৫৮ থেকে বালুরঘাটে।
নিবাস : চকভবানী, পুলক নিয়োগী লেন, বালুরঘাট।
শিক্ষা : প্রাইভেটে বি.এ. পার্ট ওয়ান পর্যন্ত।
পেশা : পি.ডব্লিউ.ডি.-তে গ্রুপ 'ডি' থেকে শুরু করে করণিক হয়ে ২০০৬এ অবসর।
বিবাহ : ১৭ এপ্রিল ১৯৭০।
স্ত্রী : মাধুরী
সন্তান : দুই মেয়ে, যথাক্রমে পারমিতা ও সঙ্ঘমিত্রা
নাতনি-নাতি : ঐন্দ্রিলা ও ইমন
প্রথম গল্প : গরমভাত (প্রতিলিপি পত্রিকা, বালুরঘাট)
প্রথম গল্পগ্রন্থ : কুশপুত্তলিকা
প্রথম উপন্যাস : জীবিসঞ্চার

প্রকাশিত বই

কবিতা সংকলন :	মহিন্ন অসুখ মহিন্ন যন্ত্রণা	–	১৯৯১ একুশে, কলকাতা
গল্প সংকলন :	কুশপুত্তলিকা	–	১৯৯৫ রক্তকরবী, কলকাতা
	পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প	–	১৯৯৮ রক্তকরবী, কলকাতা
	কীর্তিমুখ	–	২০০১ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা
	পদযাত্রায় একজন	–	২০০৪ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা
	নির্বাচিত গল্প	–	২০০৪ দীপ প্রকাশন, কলকাতা
	ঠাকুমার তালপাখা ও অন্যান্য গল্প	–	২০০৬ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা
	শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন এবং তার মাদি মোষ	–	২০০৯ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা
	কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড়ের পিঠে	–	২০১৩ চর্চাপদ, কলকাতা
	জলের বর্গক্ষেত্র	–	২০১৬ সহজিয়া, কলকাতা
উপন্যাস :	জীবিসঞ্চার	–	২০০১ রক্তকরবী, কলকাতা
	নিরক্ষরেখার বাইরে	–	২০০২ প্রমা, কলকাতা
	তালপাতার ঠাকুমা	–	২০১২ ভাষাবন্ধন, কলকাতা
	সূর্য যখন মেষ রাশিতে	–	২০১৩ ভাষাবন্ধন, কলকাতা

সম্মাননা :

১। 'মধ্যবর্তী' সাহিত্য পত্রিকার সংবর্ধনা (২০০২)

২। কবিতা পাক্ষিক পত্রিকার সম্মননা

৩। বিশিষ্ট সাহিত্যিক সম্মাননা ও পুরস্কাব—উত্তরবঙ্গ নাট্যজগৎ

৪। Award for distinguised service in the field of literature (2008)

৫। শান্তি সাহা স্মারক পুরস্কার—পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (২০১০)

৬। কবি জীবনানন্দ স্মারক সম্মান—এবং বিকল্প (২০১১)
(জীবিসঞ্চার উপন্যাসের জন্য)

৭। বিশিষ্ট সাহিত্য সম্মাননা—রুদ্রকাল (২০১৩)

৮। বিমলা বর্মন স্মৃতিস্মারক পুরস্কার—সংবেদন প্রদত্ত (২০১৫)

৯। বদরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মান—কথাজাতক (২০১৫)

১০। রাধামোহন মোহান্ত স্মারক সম্মান—দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাব (২০১৫)

সৌজন্যে : উত্তরভাষা, বালুরঘাট